কল্পনা-রহস্য

বা

ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী।

প্রথম খণ্ড।

জীবন-স্রোত।

প্রণেতা—

শ্রীনন্দলাল দাস।

প্রকাশক—

শ্রীপশুপতিনাথ সরকার।

৩১।২ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মূল্য।০ চারি আনা।

উৎসর্গ।

দুর্দ্দিনে যিনি একটি মুখের সুমিষ্ট কথায়, আমার ন্যায় দীন-হীন কাঙ্গালকে সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, যাঁহার অভয়-বাণীতে আত্মনির্ভর করিয়া, ভবিষ্যৎ-গগনে, আমি একটা নূতন জ্যোতির পুনর্বিকাশ দেখিতে পাইতেছি, সেই বরবরণীয় বাণী-পুত্র ও মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, **শ্রীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র,** বি, এ মহোদয়ের কর-কমলে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভক্তিভাবে অর্পিত হইল।

বাগবাজার,
সন ১৩২২।

বিনীত—
শ্রীনন্দলাল দাস।

ভূমিকা ও নিবেদন।

পুস্তক আরম্ভ করিবার প্রথমেই ভূমিকার প্রয়োজন। ভূমিকা না হইলে লেখনীর মর্য্যাদা রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে, বঙ্গ-সাহিত্যের যেরূপ অসম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাতে আসল নকলের বিচার নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। অতএব ভূমিকার আড়ম্বর বৃদ্ধি করা, সে বৃথা প্রয়াস।

আমি ভূমিকা লিখিলাম না। লিখিবার সঙ্কল্প স্থির করিলাম। কালি, কাগজ ও কলম লইয়া লিখিতে বসিলাম, এবং দুই একখানি কাগজও নষ্ট করিলাম, কিন্তু যাহা ভাবিলাম, তাহা লিখিতে পারিলাম না। আমার দক্ষিণ কর তখন কে যেন সবলে চাপিয়া ধরিল। কে যেন বলিল,—"বাপু হে, তুমি যে ভূমিকা লিখ্‌তে ব'সেছ, তোমার ভূমিকা পাঠ ক'র্‌বে কে? তুমি একজন সামান্য ব্যক্তি, সামান্য কয়েকদিন মাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রেছ ব'লে এতে কি এতই কবি বনে গেছ? আরে রামগঙ্গা! অমন কাজও ক'র না। তোমার অপরাপর পুস্তকগুলি যে বাজারে কাটতি হয় এই যথেষ্ট। দরিদ্র ব'লে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তোমায় যে সাহায্য করেন, সাহিত্য-সেবী ও নব্য লেখক ব'লে তাঁহারা যে এতখানি উৎসাহ দেন, এই তোমার বহুভাগ্য। যাও, আর অধিক বাড়াবাড়ি ক'র না; পার ত' একজন যোগ্য ব্যক্তির তোষামোদ কর্‌বার চেষ্টা কর।"

কি আর করিব, বাধ্য হইয়া ভূমিকা লেখা বন্ধ করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমার দুরাদৃষ্টক্রমে, সেটুকু আর কার্য্যে পরিণত হইবে না। হায়! দরিদ্র সাহিত্যিকের মুখ চাহিয়া, কে এমন সাহায্য করিবেন? এমন কার্য্যে কেই বা হস্তক্ষেপ করিবেন? কেহই

নাই, আমার যে কেহই নাই। আমার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নাই। আমার রসিকরাজ অমৃতলাল নাই। আমার মহামহোপাধ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর নাই। আমার বঙ্গ-সাহিত্যের পঞ্চ-ভূতাত্মা পাঁচকড়ি ঠাকুর নাই! আমার জলধর নাই, আমার শশীভূষণ নাই, এক কথায় বলিতে হইলে, আমি আর আমার পাঠকবর্গ ব্যতীত, অন্য কেহই নাই।

প্রাণপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! এতগুলি বাজে বকিলাম, বলিয়া, আমার প্রতি আপনারা অসন্তুষ্ট হইবেন না। মনের দুঃখে এত কথা বলিলাম। আপনারা আমার দুঃখ বুঝিয়াছেন, তাই বারম্বার আপনাদেরই কাছে ছুটিয়া আসি। চিরদিন আপনাদেরই আশ্রয় অভিলাষ করি।

ভূমিকা বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া, এইবার নিবেদনের পালা আরম্ভ করিলাম। আঃ!—পোড়া ছাই নিবেদনই বা কি করিব? যাঁহাদের নিকট চিরদিনটাই নিবেদন আবেদন করিয়া আসিতেছি, তাঁহাদের নিকট আবার নূতন নিবেদন কি আছে? তবে একটু বলিতে হয়, তাই বলিতেছি।

পাঠকগণ! আজ আমার এই পুস্তকখানি গ্রহণ করিয়া, আমায় চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। এখানি চতুর্থ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ড দুই মাস অন্তর বাহির করিবার চেষ্টা করিব। আমার এ অনুরাগ ও উদ্যম যাহাতে ফলে পরিণত হয়, আপনারা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, দীন গ্রন্থকারকে বাধিত করিবেন।

বিনীত

শ্রীনন্দলাল দাস।

কল্পনা-রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুঙ্গেরের সামান্য ভূমি অধিকার করিয়া, ভাগীরথীর ঠিক দক্ষিণ পাটে, জন বেকারের নীলকুঠী অবস্থিত। সে বহু দিবসের কথা আলোচনা করিতেছি। তখন আমাদের বাঙ্গলা—প্রাচীন বাঙ্গলা! আমাদের বাঙ্গালী—প্রাচীন অসভ্য বাঙ্গালী।

মাঘ মাস। শীতের অবসান কাল সম্মুখীন দেখিয়া, নব-বধূরাণী বসন্ত-সুহাসিনী, কুসুম-কুমুদিনীর ন্যায় অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রিয়বল্লভ পবন-পদতলে বিলুণ্ঠিতা হইতেছিলেন। পুষ্প-পরাগ মাখা সান্ধ্য-সমীরণ, অতীতের ভগ্ন-বক্ষে, তখন একটা তন ভাবের ও নূতন সৌন্দর্য্যের আয়োজন করিতেছিলেন। সেদিন শনিবার, মাঘ মাসের ২৮শে তারিখ।

শনিবার—সপ্তাহের শেষ দিন! সেদিন নীলকুঠীর শ্রমজীবি কুলীগণ, দিবাবসানের পূর্ব্বাহ্নেই ছুটি পাইয়াছিল। প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা, জনকণ্ঠ-কোলাহল শূন্য হইলেও, কুঠীর একখানি সুসজ্জিত মনোরম কক্ষে, বেকার সাহেব তাঁহার বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ভৃত্য কালাচাঁদকে লইয়া, তখনও উপবিষ্ট ছিলেন। নিম্নতলের বৃহৎ ক্যাস ঘরে, কেসিয়ার বাবু মৌলবীজান তখনও হিসাব-নিকাশ সারিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মৌলবী সাহেব তিনি তাঁহার কার্য্য বশতঃ আবদ্ধ থাকিতে

পারেন ; কিন্তু কুলী-সর্দ্দার কালাচাঁদ যে রহিয়াছে, সে কেবল তাহার প্রভুভক্তির গুণে। সাহেব আদেশ করিয়াছেন, তাই সে অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে। সাহেবকে সে পিতৃ-তুল্য মান্য করিয়া থাকে। সেই কারণে তাহার প্রতি সাহেবেরও অযাচিত করুণা ও অপ্রত্যাশিত অনুরাগ! সাহেব মধ্যে মধ্যে তাহাকে প্রায়ই এইরূপ ভাবে আহ্বান করিয়া থাকেন।

কক্ষের মধ্যে একখানি মূল্যবান কৌচে বসিয়া, সাহেব ধূমপান করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে অপর একখানি অল্প মূল্যের চেয়ারে বসিয়া, সর্দ্দার কালাচাঁদ নতমুখে নিয়তীর চিন্তা করিতেছে। সে চিন্তা তাহার সুখের চিন্তা!

ইত্যবসরে সাহেবের ধূমপান শেষ হইল। অর্দ্ধ-দগ্ধ চুরুটটি ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া, তিনি সহাস্য-মুখে কহিলেন,—"কালাচাঁদ! আমার এরূপ আচরণে তুমি কি অসন্তুষ্ট হও?"

কালাচাঁদ অতি শশব্যস্তভাবে মস্তকোত্তলন করিয়া, ধীর নম্রস্বরে কহিল,—"সাহেব! সে দুঃখে আমি দুঃখিত নহি। আপনি যে এমন কথা মুখে আনেন, 'এতেই আমার দুঃখ!—এতেই আমায় যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হয়।"

কালাচাঁদের ভক্তিপূর্ণ করুণ বাক্যধ্বনিতে, দয়াবান্ বেকার সাহেবের চিত্ত-সরোবরে, কেমন একটু নবানন্দের মৃদু-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। আনন্দে অধীর হইয়া, কালাচাঁদের পৃষ্ঠদেশে উপর্য্যুপরি দুই তিনবার মৃদু-করাঘাত করিয়া, তিনি কহিলেন,—"কালাচাঁদ! এই জন্যই আমি তোমায় এত স্নেহ করি।"

সাহেবের সদ্ব্যবহারে লজ্জাবনত মুখখানি অধোবনত করিয়া, কালাচাঁদ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, মৌনভাবে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল।

সাহেব পূর্ব্বভাব প্রকাশ করিয়া পুনরায় কহিলেন,—"দেখ কালাচাঁদ! আজ যে তোমায় আটক ক'রে রেখেছি, সে কেবল তোমারই ভালর জন্য। আমি তোমায় কিছু পুরস্কার ক'র্‌ব!"

কালাচাঁদ। সে হুজুরের অনুগ্রহ।

সাহেব। নিশ্চয়ই। শুনেছি একবৎসর পূর্ব্বে তোমার স্ত্রী দরিয়ায় ডুবে ম'রেছে, যাতে এ ক্ষেত্রে আবার সংসারী হ'তে পার, আমি সেই চেষ্টাই ক'র্‌ব। আমি যখন তোমার মনিব, তখন আমি না রক্ষা ক'র্‌লে তোমায় আর কেউ রক্ষা করবার চেষ্টা ক'র্‌বে না। কালাচাঁদ! একটী সুশ্রী ক'নে ঠিক কর, আমি আবার তোমার বিয়ে দিব।

কালাচাঁদ। ধর্ম্মাবতার! সে কাহিনী আর উত্থাপন ক'র্‌বেন না। তেমন গুণের স্ত্রী, এ নর-জীবনে আর জন্ম-জন্মান্তরেও মিল্‌বে কি না সন্দেহ।

উপরোক্ত কয়েকটি কথা বেশ আগ্রহভরে প্রকাশ করিয়া, পর্ট শোকাতুর দীন হীন কালাচাঁদ আর কিছুই প্রকাশ করিতে না। শুভ্র জ্যোৎস্না-স্নাত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপে ও সুকোমল বদনমণ্ডল যেন মসিবর্ণে আচ্ছ নেত্রপ্রান্তে ফোঁটা কতক বিষাদাশ্রু নির্গ তাহার ব্যথিত বক্ষঃস্থল স্পর্শ ক দৃশ্য সবিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ ক স্বর শুনিয়া, তিনি বিশেষ এব

সাহেব কহিলেন,—"
আমি কি কোন মন্দ ক
বিয়ে ক'র্‌লে তুমি ভ

কালাচাঁদ ধীর

আর ক'র্‌বেন না। সে আদেশ পালনে আমি একান্ত অসমর্থ; এ জীবনে আমি অন্য দার-পরিগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌ব না। তা পার্‌ব ন —কিছুতেই পার্‌ব না। এ হৃদয়-মন্দিরে যে দেবী-প্রতিমা-মূর্ত্তি এক-দিন কত সাধে অঙ্কিত ক'রেছি, তার অকাল বিসর্জ্জনে, যে মাধুরী-রেখা আজও মুছে যায়নি, যে সুবর্ণ-রূপোচ্ছটা এ শোকার্ত্ত অন্তঃকরণে আজও বর্ত্তমান র'য়েছে, এজীবনে তার স্নেহ আমি কিছুতেই ভুল্‌ব না! ভুল্‌ব না—ভুল্‌তে পার্‌ব না।"

সাহেব। কি! অন্য নারীকে তুমি বিবাহ ক'র্‌বে না?

কালাচাঁদ। না। অন্য নারী যদি পরমাসুন্দরী হয়, যদি রূপে-গুণে সে জগতের অতুলনীয়া হয়, তথাপিও আমি তাকে গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌ব না।

সাহেব। কালাচাঁদ! ওটা তোমার মনের ভ্রম। যে ম'রে গেছে তার সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি? সে ত এখন ভূষমন! যাও, আমার শা রাখ; অর্থ যা দরকার হয় দিচ্ছি, একটা মনের মতন দেখে কর।

হব! ত্রুটি মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। এ অনুরোধ

। আমায় মনিবের অবাধ্য ক'র্‌বেন না।

শন ক'র্‌তে পার্‌ব না।

কি ব'ল্‌ছ?

সাহেব! আমায় মার্জ্জনা করুন!

যাবে।

রিয়া, তিনি তাঁহার সুবর্ণ-

তিত্ব লাভ করিল।

কত?"

সাহেব। ৬টা বাজে।

কালাচাঁদ। এত হ'য়েছে।

সাহেব। হাঁ।

নিরুত্তরভাবে সুন্দর ওয়াচটি যথাস্থানে রাখিয়া, সাহেব তাঁহার কাশ্মেরী সুটের দক্ষিণ জেব হইতে, সুবাস-সিক্ত রুমালখানি বাহির করিলেন। দক্ষিণ পথের গবাক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সহসা কোথা হইতে সান্ধ্যবায়ু-বিতাড়িত পুষ্পাঘ্রাণ ভাসিয়া আসিয়া, সাহেবের বিরামদায়িনী কক্ষতল আমোদিত করিয়া তুলিল। রুমালে যথেষ্ট পরিমাণে সেণ্ট মাখান ছিল। একে ফুলের গন্ধ, ইহার উপর সেণ্টের সুবাসে, নীলকুঠীরের সুসজ্জিত দ্বিতল কক্ষ যেন নন্দনে পরিণত হইল।

সাহেব রুমালের সাহায্যে চোখ-মুখ মুছিয়া, একটু চিন্তার পর কহিলেন,—"দেখ কালাচাঁদ! কালক্রমে যদিও তুমি আমার অবাধ্য হ'য়ে পড়, তথাপি আমি তোমায় কিছুতেই তাচ্ছিল্য ক'র্‌ব না। তুমি আমার উপকারী ভৃত্য! আমার পরম হিতকারী ব্যক্তি।"

কালাচাঁদ ধীর সলজ্জভাবে মস্তক অবনত করিয়া কহিল,— "সাহেব! সে আমার সৌভাগ্য। ভৃত্য হ'য়ে যে মনিবকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পারি, এই বহু ভাগ্য।"

প্রসন্নচিত্তে সাহেব কহিলেন,—"বেশ—বেশ; ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন। চল, আমার সৌখীন ল্যাঞ্চে ক'রে এখন একটু জলপথ ভ্রমণ ক'রে আসি।"

কালাচাঁদ। চলুন না কেন, এতে আর আপত্তি কি?

সাহেব আর অপেক্ষা করিলেন না। বিশ্রাম-কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি সিঁড়ির পথ ধরিলেন। কালাচাঁদ তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিয়া, হৃদয়বান সাহেবকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"এতে সন্দেহ ক'র্‌তে পারে।"

কিছু না—কিছু না, আমি সব দিক সাম্‌লে নিতে পা'র্‌ব।"

"তা জানি, কিন্তু এ মিছিমিছি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা হ'ল; সামান্য বিশ হাজারে আর কি হবে বল? ও ত, হাতে মাখতেই কুলুবে না। চাল্লিশ জন লোককে বাদন দিতে হ'লে, অন্ততঃ পক্ষে চাল্লিশ হাজারের কম কিছুতেই হবে না। সন কাবার হ'য়ে গেছে, এখন যদি ভাঁড়া ভাঁড়ি করি, তা হ'লে দলশুদ্ধ লোক খেপ্পা হ'য়ে দাঁড়াবে। তারা নীরেট গণ্ড-মূর্খ, সন্দেহ ক'রে হয় ত' একটা সমূহ অনিষ্ট ক'রে ব'স্‌ব।"

"তুমি যখন র'য়েছ, তখন আর অতটা চিন্তা করি না। বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধির নিকট, মূর্খের শক্তি চির দিনই হ্রাস পায়।"

"তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না; দু চার দিন হ'লে চলে। আজ মাসাবধি কাল ভাঁড়িয়ে আস্‌ছি। আজ তাদের শেষ দিন। আজ যদি আবার ভাঁড়াই, তা হ'লে সে অনুরোধ কিছুতেই টিক্‌বে না। এ স্থলে আমার কোন বুদ্ধিই সুফলপ্রদ নহে।"

"আহা, ভাঁড়াতে হবে কেন? এই বিশ হাজার বণ্টন ক'রে দিয়ে ব'ল্‌বে, যে দুই সপ্তাহ পরে আবার দিব। হাজারের স্থলে পাঁচশ' ক'রে পেলে তারা বোধ হয় কিছুই আপত্ত ক'র্‌বে না, কি বল?

"তা না ক'র্‌তে পারে; কিন্তু পনর দিন পরে আবার টাকা কোথায় পাবে? আমাদের প্রতি এখন পুলিশের যেরূপ দৃষ্টি র'য়েছে এতে যে দু এক মাসের মধ্যে কিছু আয় হবে, এমন ত' বোঝায় না।"

"সে জন্য তোমায় চিন্তা ক'র্তে হবে না। অকাল-মৃত্যু অপেক্ষা অনাহার মঙ্গল। কাজ কিছু দিন বন্ধ থাকে থাকুক। খরচ আমি অক্লেশে চালিয়ে নিব। মুঙ্গেরে যত দিন নীল-কুঠী বর্ত্তমান থাক্‌বে, তত দিন বিশ পঁচিশ হাজারের জন্য আকাশ পাতাল ভাব্‌তে হবে না। তুমি যাও, নির্ভসায় কাজ চালাও।"

"কাগজ ভাঙ্গাব কোথায়?"

"পেশোয়া সাহেবের কাছে।"

"তিনি কি এত টাকা দিতে স্বীকৃত হবেন?"

"নিশ্চয়ই হবেন। সে সুবন্দোবস্ত আমি পূর্ব্বেই ক'রে এসেছি।"

"তবে এখন এগুই, কেমন?"

"যাও!—খুব সাবধান! এ বিষয় যেন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না হয়।

"সে সাবধানের কথা আর আমায় ব'ল্‌তে হবে না। তুমি নিজে ঠিক থাক্‌লেই হ'ল!"

"যাক, এখন কোন্ পথে যেতে চাও?"

"প্রাচীর উলঙ্ঘন ক'রে দরিয়ায় প'ড়ব। ভাঙ্গা ঘাটে পান্‌সী বাঁধা আছে।"

"আর কেউ সঙ্গে আছে নাকি?"

"হাঁ, জুনিয়া বিবি এসেছে।"

"বেশ—তবে যাও, আর বিলম্ব ক'র না। পথটা বড় নিরাপদ নয়। যাও, আমি দুই ঘন্টা সময়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।"

এই কথা বলিয়া একটি ভীম-বলিষ্ঠকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, বৃহৎ নীলকুঠীর পশ্চাৎ-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পথে সে বায়ু-বেগে চলিতে লাগিল। অপর ব্যক্তি সে যুবক। তাহার বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর হইবে। প্রৌঢ় ব্যক্তির সতর্কতা নিরীক্ষণ করিয়া, সে আর সামান্য কালও অপেক্ষা করিল না।

একটি আম্র বৃক্ষের শাখা বেষ্টন করিয়া, পর মুহূর্ত্তেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

তখন সন্ধ্যাকাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতিবক্ষে ক্ষীণ অন্ধকার বিস্তৃত করিয়া, রজনী-দেবী ক্রমেই ভীষণতর বেশ পরিগ্রহ করিতে-ছিলেন। এই অবসরে বেকার সাহেব তাঁহার মূল্যবান নাইট্-ড্রেসে সুসজ্জিত হইয়া, প্রিয়ভৃত্য কালাচাঁদের সহিত জলপথ ভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রাঙ্গণের উত্তর প্রাচীরে খিড়কী দ্বার। এই দ্বার উন্মুক্ত হইলে সম্মুখেই গঙ্গা-পথ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহার সঙ্কীর্ণ পথটুকু সমানে গঙ্গা-তল সংলগ্ন।

দ্বারের সম্মুখেই প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধা ঘাট। ঘাটের পূর্ব্ব পার্শ্বেই সাহেবের ক্ষুদ্র পান্‌সীখানি. সেদিন গঙ্গার অল্প বারি-বক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া, মৃদু তরঙ্গ হিল্লোলে সদাই নৃত্য করিতেছিল।

সাহেব প্রফুল্লান্তঃকরণে নির্জ্জন প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া, যখন খিড়কী দ্বারের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহার অনুমতি পাইয়া, কালাচাঁদ যখন চাবিরুদ্ধ দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কোথা হইতে প্রলয়ের একটা ভীষণ বজ্রাঘাত নিক্ষিপ্ত হইয়া, তাঁহাদের চিরশান্তিময় জীবন-পথে কঠোর আঘাত প্রদান করিল। সে বড় সাংঘাতিক বজ্র! তাহার জ্বালাময় প্রতিঘাতে, ধর্ম্মাত্মা কালাচাঁদের হৃদয় সবলে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার দিব্যজ্যোতিঃপূর্ণ বিশাল দৃষ্টিপথে বিপদের অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিল। জগৎ নিস্তব্ধ হইল। তমসাময়ী মেদিনী-অঙ্কে ভীমান্ধকারে আরও মলিনত্ব ফুটাইয়া তুলিল। হতভম্বের ন্যায় সে নীরবে চাহিয়া রহিল।

সাহেবের বিশ্বাসী কেসিয়ার মৌলবীজান, কোথা হইতে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, সাহেবের পদতলে পড়িয়া, একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনার তত্ত্ব নিরূপণ

করিবার প্রয়াসে, সাহেব কহিলেন,—"ব্যাপার কি? তুমি এমন ক'র্‌ছ কেন?"

অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, মৌলবীজান উঠিয়া দাঁড়াইল। কম্পিত বাহুদ্বয় দুই চক্ষে চাপিয়া, কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল,—"সাহেব! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তহবিল তছরুপ হ'য়েছে।"

মৌলবীজানের খেদপূর্ণ কঠোর বাক্যে ভাগ্যবান্ বেকারের যেন চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল হতভম্বের ন্যায় নীরবে অবস্থান করিয়া, পরক্ষণে তিনি কহিলেন,—"সে কি কথা! আমি যে তহবিলে কাল স্বহস্তে বিশ হাজার টাকা রেখেছি।"

মৌলবীজান বায়ুস্পন্দিত বেতসীর ন্যায় কম্পিত ভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"চুরি গেছে সাহেব—চুরি গেছে!"

সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ে কহিলেন,—"অ্যাঁ! বল কি? এমন বিশ্বাসঘাতকতা কার দ্বারায় হ'তে পারে? তুমি আমার কেসিয়ার। আজ এক বৎসর কাল এই কর্ম্মে নিযুক্ত র'য়েছ, এক দিনের জন্য একটি পয়সাও তঞ্চক হয়নি; কিন্তু আজ এমন হ'ল কেন? এমন কাজ কার দ্বারায় হ'ল? তোমার সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে, এমন দুঃসাহসী কাজে কে হস্তক্ষেপ ক'র্‌লে? মৌলবীজান! তুমি আমার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। যদি কিছু জেনে থাক, তা হ'লে সত্য কথা বল। তোমার কি কারও প্রতি সন্দেহ হয়?"

মৌলবী। সাহেব! যার দ্বারায় এ কাজ হ'য়েছে, তাকে আমি খুব জানি; কিন্তু সত্য কথা প্রচার ক'র্‌তে কেমন যেন ভয় হচ্ছে।

সাহেব। তুমি নির্ভয়ে ব্যক্ত কর। টাকা খোয়া গেছে ব'লে যে এতই দুঃখিত—তা নয়; গেছে—সে আবার হবে! এখন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবিধান ক'র্‌তে চাই। দুষমনকে দণ্ড-প্রদান করাই মানুষের কাজ।

সাহেব মৌলবীজানকে যথেষ্ট আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু সে আশ্বাসে তাহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে, তাহার মলিন বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে যেন সবলে চাপিয়া ধরিল। রসনা-শক্তি হীন হইয়া পড়িল। অগ্নি-বিস্ফারিত নেত্রে, কালাচাঁদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, সে কেবল নীরবে চাহিয়া রহিল।

মৌলবীজানের এ ব্যবহারে সাহেব সবিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রোধে দলিত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"নির্ব্বোধ! প্রকৃত কথা সত্বর ব্যক্ত কর। তা যদি না কর, তা হ'লে এ ক্ষেত্রে তুমিই দোষী। আমি তোমাকেই চোর ব'লে সাব্যস্ত ক'র্ব "

মৌলবীজান আর কোনও প্রকারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সাহেবের ভীষণ তিরস্কার বহ্নিতে, তাহার অশান্তি বিধ্বস্ত চিত্তাগারে, ভীম-হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে কহিল,—"সাহেব! আমি নির্দ্দোষী! দীন দুনিয়ার মালিক খোদা জানেন—আমি নির্দ্দোষী।"

সরল ও প্রকৃতিস্থ চিত্তে সাহেব কহিলেন,—"আমারও তাই বিশ্বাস। তোমার দ্বারায় যে এ কাজ হবে, এ কল্পনাতেও আন্‌তে পারি না। যদি কারো প্রতি তোমার সন্দেহ হ'য়ে থাকে, তাই বল। আমি তাই তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি।

মৌলবীজান কহিল,—"হুজুর! আজ বেলা চারটার সময় কালাচাঁদ যখন আমার কাছে গিয়েছিল, আমার মনে তখনই কেমন যেন একটা খট্‌কা লেগেছিল; কিন্তু বিশ্বাসী ব'লে তখন আর ততটা তলিয়ে ভাব্‌তে পারিনি। তার পর এখন দেখি, যে ক্যাস শূন্য! বিশ হাজারের চিহ্ন মাত্র নাই।"

কালাচাঁদ এতক্ষণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। মৌলবীজানের কোনও কথার প্রত্যুত্তর দিতে তাহার যেন একটুও সাহস কুলাইতেছিল না; কিন্তু শেষাবস্থায়, ভাগ্য তাহার সবলে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বজ্রাহত পথিকের ন্যায় বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া সে কহিল,—"কি সর্ব্বনাশ! আমি যে এর কিছুই জানি না।" সাহেব! আমায় ক্ষমা করুন। আমি নির্দ্দোষী! ঈশ্বর জানেন, এ ক্ষেত্রে আমি কোন দোষের দোষী নহি।"

কালাচাঁদ—ধর্ম্মভীরু কালাচাঁদ—নিষ্কলঙ্ক কালাচাঁদ—দরিদ্র কুলী-সর্দ্দার কালাচাঁদ,—আর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সাহেবের যুগল-পদতলে পড়িয়া, সে সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার নয়নের অজস্র বারিবিন্দু-পাতে, দয়াবান ইংরাজ পুরুষের কোমল প্রাণ মুহূর্ত্তেই বিগলিত করিয়া ফেলিল। আশ্বস্ত চিত্তে সাহেব কহিলেন—"কালাচাঁদ! আমি তোমায় বড়ই বিশ্বাস ক'র্‌তুম। কেবল বিশ্বাস নয়; অন্তরের সহিত অত্যন্তই স্নেহ ক'র্‌তুম। লণ্ডনে আমার পুত্র এখন জীবিত র'য়েছে, তার সুকোমল মুখমণ্ডল দেখবার জন্যে যতটা না ব্যাকুল হই, তোমাকে না দেখলে এ হৃদয়ে যেন ততটাই মর্ম্মান্তিক জ্বালা অনুভব করি। ছি! ছি! এত স্নেহের কি পরিণাম? বিশ্বাসের কি এই প্রতিদান?"

সাহেবের খেদোক্তি পূর্ণ বাক্য শুনিয়া কালাচাঁদ কহিল—"সাহেব! আমায় মার্জ্জনা করুন। আমার এ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর, এ ভগ্ন বক্ষোপরে, আর এমন ভয়াবহকর চিত্র অঙ্কন ক'র্‌বেন না। আমি ম'রে যাবো, বুক ফেটে ম'রে যাবো।"

সাহেব। কালাচাঁদ! ভয় নাই; আমার দ্বারায় তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। যাক্, বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছ, খুব ভালই ক'রেছ! আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ। এ জীবনে কখন আর

বাঙ্গালীকে বিশ্বাস ক'রব না। বাঙ্গালী দুষমণ! বাঙ্গালী যার খায় তারই কণ্ঠে ছুরিকাঘাত করে।

কালাচাঁদ। সাহেব! আমার দুর্ভাগ্য! যদি অবিশ্বাস করেন—তা করুন! তাতে আমার কোন ক্ষোভ নাই। ধর্ম্মের যদি দৃষ্টি থাকে, বিচারকের উপর যদি আর একজন ন্যায় বিচারক থাকেন, তা হ'লে ন্যায্য বিচার অবশ্যই হবে। দণ্ডভোগ নির্দ্দোষীর জন্য নহে; সে দুষমণের কর্ম্মান্তিক ফল ভোগ। প্রকৃত অপরাধীর শেষ পরিণাম।

সাহেব। যাও—যাও, তোমার অধিক বাচালতা শুন্‌তে চাই না। মৌলবীজানকে কি তুমি মিথ্যাবাদী ব'লতে চাও?

কালাচাঁদ। না সাহেব! আমি তেমন আকাঙ্ক্ষা করি না; কিন্তু আপনি কি আমার ধর্ম্মকে মিথ্যা ক'র্‌তে চান?"

সাহেব। বাঙ্গালীর আবার ধর্ম্ম কোথায়! বাঙ্গালী ত' তস্করের শিরোমণি! বাঙ্গালী ত' দুষমণের রাজা। বাঙ্গালী ত' বিশ্বাসঘাতকের অবতার। যাও—যাও, আমি তোমায় মানে মানে ছেড়ে দিলুম। ভালবাস্‌তুম ব'লে, তাই একটা বুটেরও ঠোক্কর মাল্লুম না।

সাহেবের হৃদয়ে ক্রোধের অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। চঞ্চল গতিতে দুই এক পদ চলাচল করিয়া, তিনি পুনশ্চ কহিলেন,—"যাও, আর এখানে অপেক্ষা কেন? সিধে পথ ধর।"

কালাচাঁদ অশ্রুপূর্ণনেত্রে কহিল,—"আচ্ছা সাহেব! তবে চল্লুম। কখন যদি দিন পাই, তা হ'লে দোষী-নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা ক'র্‌ব। যদি সময় আসে, তা হ'লে বাঙ্গালী কেমন ধার্ম্মিক, তাই দেখিয়ে দিব। আমি নিরপরাধী!—সাহেব! আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী!"

কালাচাঁদ আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না। ক্রোধে

ক্ষোভে লজ্জায় ও ঘৃণায়, তাহার আপাদমস্তক থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে, অবনত মুখে সে নীলকুঠী পরিত্যাগ করিল।

সাহেবের সেদিন আর জলপথ ভ্রমণ হইল না। একটা আন্তরিক মনবেদনায় অধীর হইয়া, তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মৌলবীজান! তোমার আজ বড়ই সুখের দিন। এত সুখ যে কেন, তা তুমিই জান। তোমার মনের কথা, আমি আমার ক্ষুদ্র কল্পনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত করিব। সে যে অব্যক্ত ভাব! অকল্পিত ভাষা।

সাহেব তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। মৌলবীজানও তাহার স্বস্থানাভিমুখে গমন করিল। তমসাচ্ছন্ন শূন্য প্রাঙ্গণ, শূন্যই পড়িয়া রহিল। সেখানে আর জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জন বেকার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুকোমল দুগ্ধফেন-নিভ শয্যাঙ্কে শয়ন করিয়া, তিনি হৃদয়ের দুশ্চিন্তা ভুলিতে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু বিফল চেষ্টা—সকলই বিফল। রজনী যত গভীর হইতে লাগিল, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে চিন্তার কুটিল রেখা ততই ফুটিয়া উঠিল। মানসিক উত্তেজনার ফলে, এমন একটা ভীষণ চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, যে তাহা সামান্য কথায় ব্যক্ত হইবার নহে।

চিন্তা!—কেবল দুশ্চিন্তা। এ সংসারে চিন্তাই মানুষের প্রধান শত্রু। চিতার আগুন যতই তেজস্কর হউক না কেন, তাহার জ্বালা ক্ষণস্থায়ী! নরদেহ ভস্মাকারে পরিণত করিতে, তাহাকে দীর্ঘকাল

বিলম্ব পাইতে হয় না। পরক্ষণেই অগ্নি নির্ব্বাপিত। সে নির্ব্বাপিত অগ্নিবক্ষে নর-দেহের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু চিন্তার আগুন সে অন্যরূপ। জীবন্ত নর-বক্ষে প্রজ্জলিত হইয়া, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইতে চাহে না। তাহার উত্তাপ অত্যন্তই প্রখর, তবুও মানুষকে সে সহজে বিনষ্ট করিতে পারে না। তিলে তিলে বিদগ্ধ করিয়া, তিলবিন্দু পরিমাণে বক্ষঃরক্ত শোষণ করিয়া, সোণার দেহ দুদিনে মরুভূমি করিয়া দেয়। শুষ্ক মরুভূমি!—তবুও তাহার সহজে বিনাশ নাই।

কি আশ্চর্য্য বলুন দেখি? চিন্তায় কাহার হৃদয়কে না পাগল করিয়াছে? যোগীর জীবন যোগ-প্রেমে উন্মত্ত করিয়াছে! ধনীর জীবন ধনসম্পদে বিচলিত করিয়াছে, নারীর জীবন পতিপ্রেমে পাগল করিয়াছে, আবার কবির জীবন, মহৎ কবিত্ব ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতে, পাগলের পাগল সাজিয়াছে। এত গুলি যে পাগল, এ কেবল চিন্তারই কারণ। চিন্তাই মানুষের মূল-মন্ত্র।

জন বেকারের আজ সেই চিন্তার পালা। ভীষণ চিন্তা-জালে আবদ্ধ হইয়া, পূর্ব্বঘটনার তিনি কিছুই ভাবানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। কখন সু—কখন কু! একবার ভাবিতেছেন,—"কালাচাঁদের দ্বারায় কি এমন কাজ হ'তে পারে? এতদিনের পুরাতন ভৃত্য, সে কি এমন গলাকাটা কাজ ক'র্‌বে? না—না, এ কথন সম্ভবপর নহে।" আবার ভাবিলেন,—"হ'তেও পারে। মানুষের মতি-গতি সকল সময়ে ঠিক থাকে না। ধর্ম্মবীর তিনিও অধর্ম্ম-পথে ধাবিত হন। কর্ম্মবীর—কর্ম্ম ভুলিয়া যান। মানুষ মাত্রেই আকাঙ্ক্ষার দাস। আকাঙ্ক্ষা যখন যে পথে বলক্ষেপ করে, মানুষ তখন সেই পথেই অগ্রসর হয়। সুপথ-কুপথ বিবেচনা-শক্তি তখন তাদের কিছুই থাকে না। বেশ বুঝতে পাচ্ছি, এ কাজ কালাচাঁদের দ্বারাই হ'য়েছে। তা

না হ'লে এমন সাহস আর কার হ'তে পারে?" পুনঃ পরিবর্ত্তন! আবার অন্য চিন্তা। কি জ্বালা! এতেও কি মানুষ সুস্থির হ'তে পারে? বেকার সাহেব পুনর্ব্বার ভাবিলেন,—"কালাচাঁদ যদি চুরিই ক'র্‌বে, তা হ'লে এতদিনই বা করেনি কেন? কত লাখ দু লাখের লোভ সম্বরণ ক'র্‌তে পেরেছে, আর আজ সে এই সামান্যের জন্য এমন কাজ ক'র্‌বে?

চিন্তার পর—চিন্তা! অনুক্ষণ চিন্তা! সর্ব্বক্ষণ সেই একই চিন্তা! কত চিন্তা, কিন্তু সাহেবের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। স্নিগ্ধ-সমীরণে—ফুলের সুবাস বহন করিয়া, সুশীতল জগতল পরিমল-সিক্ত করিল। পূর্ব্বাকাশ পরিচ্ছন্ন করিয়া দিনদেব উদয় হইলেন। নবীন দিবালোকে বিশ্ব-প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল! কিন্তু চিন্তা ভাঙ্গিল না। তিনি ভাবিলেন! কতই ভাবিলেন! ভাবিয়া বুঝিয়া অবশেষ স্থির করিলেন,—"এ রহস্য ভেদ করিতে হইলে, ডিটেক্‌টিভ চাই! ডিটেক্‌টিভ চাই।"

বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটা হইয়াছে। শশব্যস্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, জন বেকার অতি তৎপর একখানি জরুরি পত্র লিখিলেন। সে পত্রের শিরোনামায় একটি মুসলমানের নাম সন্নিবিষ্ট হইল। ঠিকানা—মুঙ্গের ডিটেক্‌টিভ পুলিস। নাম—মহম্মদ গরিজান্।

সাহেবের পত্র লইয়া দ্বারবান্ আদেশ পালন করিতে ছুটিল। ডিটেক্‌টিভ সাহেব এখনি আসিবেন, কিন্তু তবুও চিন্তা মিটিল না। আবার সেই বিষয়ের আন্দোলন! আবার সেই চিন্তার জ্বালা। প্রায় পাঁচ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া গেল, জ্বালা তবুও কমিল না। জ্বালা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সে মনের জ্বালা, টাকার

জ্বালা নহে। সে বিস্ময়ের জ্বালা, প্রকৃত দুর্ঘটনার নহে। "এমন কাজ কে করিতে পারে? এমন কাজ কাহার দ্বারায় হইতে পারে?"

সাহেব আর একলাটি নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। শীতের একটু কন্‌কনানি থাকিলেও, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম ছুটিয়া গেল। কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। দ্বারের সম্মুখে একজন অজানিত আগন্তুক ব্যক্তি আসিয়া, সহাস্যে কহিল,—"সেলাম সাহেব! খবর কি?"

আগন্তুক প্রাচীন ব্যক্তি। আকার প্রকারে বোঝায়, তিনি আমাদেরই বাঙ্গালী। পরিধানে একখানি মোটা থান, গায়ে পিরাণ, এবং পদ-যুগলে এক জোড়া কট্‌কি পাদুকা। গালপাট্টা ভর্ত্তি চাঁপদাড়ী। অনুমানে বোঝায় তিনি ব্রাহ্মণ।

সাহেব ইতঃপূর্ব্বে ইঁহাকে কখনও দেখেন নাই। ইনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি। বিস্ময়াবনত চিত্তে কহিলেন,—"কে তুমি! তোমার নিবাস কোথায়?"

আগন্তুক কহিলেন,—"নিবাস মুঙ্গেরে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।"

সাহেব। ব্রাহ্মণ!—তা এখানে কেন? আমার কাছে কি তোমার কোন প্রয়োজন আছে?

আগন্তুক। না! বোধ হয় আমার কাছেই আপনার প্রয়োজন আছে।

সাহেব। সে কি কথা! আমি ত তোমায় চিন্‌তেই পা'র্‌ছি না। কখন যে দেখেছি, এমনও বোঝায় না।

আগন্তুক। যাক্‌, তবে আমি বাহাদুর।

সাহেব। তুমি কি উন্মাদ?

আগন্তুক। না—না, আমি আপনার দ্বারায় একটা কাজ করিয়ে নিব। আপনার যে মাইনা করা ধোপা আছে, কাজটা তার দ্বারাই হবে; আপনি কেবল উপলক্ষ মাত্র।

সাহেব। কেন, সুট্ কাচতে চাও?

আগন্তুক। আজ্ঞে না; আমার এই চাপদাড়িটা কেচে দিতে হবে। এটায় বেজায় আবর্জ্জনা জ'মেছে।

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, আগন্তুক তাঁহার বৃহৎ দাড়িটি খুলিয়া ফেলিলেন। কি আশ্চর্য্য! এ যে পরচুলের দাড়ি। এ ব্যক্তি যে বেকার সাহেবের চিরপরিচিত বন্ধু। যাঁহার নিকট ইতঃপূর্ব্বে তিনি পত্র পাঠাইয়াছেন, ইনি সেই ব্যক্তি। ইঁহারই নাম মহম্মদ গরিজান।

সাহেব অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সবিস্ময়ে কহিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! আপনি এমন ভোল্ ফিরিয়েছেন? সাবাস্ আপনার বুদ্ধি।"

গরিজান সহাস্তে কহিলেন,—"বুদ্ধি আর কি? এই রকম নূতন নূতন ভোল্ ফিরানই আমাদের ভাত-ভিত।"

সাহেব। যাক, আমাদের ব্যাপার বোধ হয় শুনেছেন?

গরিজান। কতক কতক শুনেছি।

সাহেব। কি রকম বুঝছেন, বলুন দেখি?

গরিজান। সেটা এখন ঠিক বুঝতে পারিনি। দু-একদিন না গেলে, কিছুই ব'লতে পারব না।

সাহেব। আমার বিশ্বস্ত কেসিয়ার মৌলবীজান যার উপর সন্দেহ ক'রেছিল, তাকে কালই তাড়িয়েছি।

গরিজান। বড় ভাল কাজ করেন নি।

সাহেব। কেন? তস্করকে কি প্রশ্রয় দিতে বলেন?

গরিজান। না—তা বলি না। তবে সে ব্যক্তি প্রকৃত চোর কি না, তা আপনি জানেন কি?

সাহেব। না তা জানি না। আমার কেশিয়ার কি মিথ্যাবাদী?

গরিজান। হ'লেও হ'তে পারে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

সাহেব। বলেন কি?

গরিজান। যা বলি—তাই ঠিক। আচ্ছা, কাল সন্ধ্যাকালে আপনার বাঁধাঘাট থেকে কি কোন পান্‌সী বেরিয়েছিল?

সাহেব। না। আমি একটু বেড়াবার ইচ্ছা করেছিলুম বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেটা হ'য়ে ওঠেনি।

গরিজান। হাঁ!—যা ভেবেছি তাই।

ডিটেক্‌টিভ গরিজান বিশেষ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সে চিন্তার কারণ, কল্য সন্ধ্যাকালে গঙ্গাবক্ষে তিনি যে পান্‌সীখানি দেখিয়াছিলেন, সেখানি বড় সহজ পান্‌সী নহে। নীলকুঠীর এই অপহৃত ব্যাপারের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাহার কোন যোগাযোগ আছে। তা না হ'লে, খেয়াঘাট অতিক্রম করিয়া, সেখানি পথ-বিহীন- ভাঙ্গা-ঘাটে আসিবে কেন? সন্ধ্যাকাল—তদুপরি কৃষ্ণপক্ষ! এ সময় তেমন স্থানে প্রয়োজনই বা কি?

গরিজানের হৃদয়ে চিন্তার সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত আঘাত করিতে লাগিল। তিনি আর অধিক সময় নীরবে থাকিতে পারিলেন না। বিশেষ নম্রতা-বিশিষ্ট স্বরে কহিলেন,—"সাহেব! আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। মাস দুই অপেক্ষা ক'র্‌লে, আমি নিশ্চয়ই এ রহস্যের মীমাংসা ক'র্‌তে পারবো।"

সাহেব কহিলেন,—"এত বিলম্ব হবে?"

গরিজান। হয় ত' তারও বেশী দিন সময় লাগবে। এ বড় সহজ ব্যাপার নয়। বড়ই জটিলতাপূর্ণ!—বড়ই ভীষণ।

সাহেব। আপনি কি ব'ল্‌তে চান, এ কাজটা দু একজনের দ্বারায় হয় নি? আমার অনুমানিত ব্যক্তি তবে কি নির্দ্দোষী? এ ক্ষেত্রে আপনি কি তাই সপ্রমাণ ক'র্‌তে চান?

গরিজান। হাঁ! আমি বেশ স্পর্দ্ধার সহিত ব'ল্‌তে পারি যে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আপনি তাকে অবুঝের ন্যায় বিতাড়িত ক'রেছেন।

সাহেব। তাই ত, আপনি যে আমায় গোলোকধাঁধার মধ্যে ফেল্‌লেন।

গরিজান। তা হ'তে পারে। ও রকমটা মানুষের প্রায়ই হ'য়ে থাকে। ও চিন্তা আপনি পরিত্যাগ করুন। চিন্তা-ভার এখন আমারই শিরে ন্যস্ত।

সাহেব। আমায় এখন কি ক'র্‌তে বলেন?

গরিজান। যদি বাণিজ্য বিষয়ক কোন কাজকর্ম্ম থাকে, তাহ'লে সে কাজ সহাস্য মুখে সমাধা ক'র্‌তে পারেন। মুঙ্গেরে যতদিন ডিটেক্‌টিভ গরিজান জীবিত থাক্‌বে, ততদিন আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি এখন উপস্থিত চল্লুম। হাতে একটা মস্ত কাজ র'য়েছে, তা না হ'লে আরও কিছুক্ষণ থাক্‌তুম। বেঁচে থাকি ত কল্য সন্ধ্যার পর আবার সাক্ষাৎ হবে।

এই কথা বলিয়া গরিজান অতি সত্বরেই সাহেবের কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সাহেব ক্ষণকাল তন্ময়চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর চিন্তিত মনে, অতি ধীরে ধীরে কক্ষ-বাতায়নে বাহির হইয়া, তিনি সিঁড়ি-পথে নিম্নতলে নামিতে লাগিলেন।

তখন বেলা নয়টা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনিবের নিকট বিতাড়িত হইয়া, দরিদ্র কালাচাঁদের আজ অবস্থার ব্যবস্থা নাই। দেখিতে দেখিতে পরবর্ত্তী ঘটনার চারি দিবস কাটিয়া গিয়াছে। কত বৃষ্টিপাত হইয়াছে! কত প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈরাগ্য-পথ হইতে তাহাকে কেহই ফিরাইতে পারিল না। উদরে অন্ন নাই—তত্রাচ সে চলিয়াছে। কোথায় কতদূরে যাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

পাঠক! একবার ব্যাপার বুঝিয়া লউন। সুপথ হইতে মানুষ কতটুকু সময়ের মধ্যে বিপদে পতিত হয়, তাহাই দেখুন। আমার চক্ষে দেখুন, আপনার চক্ষে দেখুন, আমার কল্পনার চক্ষে দেখুন। দেখুন, কালাচাঁদের আজ কি ভীষণ দুর্দ্দিন। দেখুন, কালের গতিতে নির্দ্দোষীকেও কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়!

আমি যতদূর জানি, ইহাতে কালাচাঁদকে অম্লান মুখে নির্দ্দোষী বলিব। কারণ, যে ব্যক্তির অন্নদাতার প্রতি এত প্রগাঢ় ভক্তি, স্বার্থ-শূন্য প্রাণে মনিবের আদেশ পালন করিতে, যে নিজের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে, মনিবের দশ টাকা অধিক আয়ের নিমিত্ত, যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেও কাতর নহে, চরিত্রবান্ উচ্চ শিক্ষা বক্ষে লইয়া, স্বার্থময় নর-সমাজে যে এতদূর উন্নত, কালের বশে তাহার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া, আমিও কি তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব? না—তাহা পারিব না! সেটা ঠিক মানুষের কাজ হয় না। দেবতাকে ঘৃণিত তস্কর বলিয়া উপহাস্য করা, সে তস্করেরই যোগ্য কর্ম্ম! তোমার আমার নহে।

কালাচাঁদ চলিল। চলিতে চলিতে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের

তলায় আশ্রয় লইয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে একটু বিশ্রাম করিতে বাসনা করিল; কিন্তু সে বাসনা তাহার অকালেই বিসর্জ্জন হইল। মন প্রবৃত্ত হইল না। সুদূর গঙ্গা-পথ ধরিয়া সে আবার চলিতে লাগিল। হায় রে দুর্দ্দিন! হায় রে কঠোর প্রাণ! হায় রে চণ্ডালাকৃতি ছিন্ন-মমতা! ধন্য তোমার সহিষ্ণু। ধন্য তোমার কষ্ট স্বীকার। অনশনে অনাহারী, বস্ত্রাভাবে ছিন্ন-বস্ত্র পরিধান, তৈলাভাবে রুক্ষ জটায় শিরাচ্ছন্ন, তবুও দুর্ভাগার মৃত্যু নাই। জীবনের অমূল্য মায়া পরিত্যাগ করিতে, তবুও তখন সে অস্বীকৃত।

যাও কালাচাঁদ—অগ্রসর হও! সংসার সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া, ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত হও। জয়-পরাজয়ের জন্য তোমায় কোন চিন্তা করিতে হইবে না। ঈশ্বর তোমার সহায়! ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করিবেন।

কালাচাঁদ কতক্ষণ চলিল। চলিতে চলিতে চলচ্ছক্তিরহিতাবস্থায় তাহার চরণ-যুগল অবশ হইয়া পড়িল। ক্ষুধার তাড়নায় দিবালোক বিস্তৃত উজ্জ্বল দিঙ্মণ্ডল, ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিল। সে আর চলিতে পারিল না। নির্জ্জন জাহ্নবী-তটে বসিয়া, চিন্তা-বেড়া-জালে, মৃগ-শাবকের ন্যায় চিরাবদ্ধ হইয়া পড়িল। কত চিন্তা! কত জালা! হায়! সে জালার তুলনা কোথায়?

ক্ষুধার্ত্তজীব ক্ষুধায় বিশেষ কাতর হইলেও, তাহার চক্ষে সহজে অশ্রু নির্গত হয় না। বুক ফাটিয়া যায়, তত্রাচ চক্ষু ফাটিয়া এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইতে সহজে দেখা যায় না। কিন্তু কালাচাঁদের দীর্ঘ-লোচন বিগলিত হইয়া, অজস্র অশ্রু-প্রপাতে, তাহার গৌর-কান্তি প্রশস্ত-বক্ষ অবিরাম সিক্ত করিতে লাগিল।

দিবা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের রবি, তাঁহার লোহিত-রাগ-নিঃসৃত কিরণ-মালা বিস্তার করিয়া, স্বচ্ছ জাহ্নবী-জলে

সুবর্ণ-খেলা খেলিতেছেন। তখন দিবসের তৃতীয় যাম। কালাচাঁদ কাতর মনে কাঁদিতেছিল, এমন সময় পুণ্যময়ী জাহ্নবী-বক্ষে কোথা হইতে নারী-কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল। সে সুমিষ্ট সুকণ্ঠ! তাহার আবৃত্তি-বিকাশে, কালাচাঁদের চিন্তাদগ্ধ প্রাণে সহসা যেন ক্ষীরদ-ধারা বর্ষিত হইল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা মুহূর্ত্তে কোথায় চলিয়া গেল। সে চাহিয়া রহিল। উদাস চিত্তে, তন্ময়-নেত্রে, দূর গঙ্গা-বক্ষে চাহিয়া, একখানি ক্ষুদ্র তরণীর প্রতি তাহার মন যে কতদুর আকৃষ্ট হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। তরণীতে রমণী আছে। এ সঙ্গীত সেই রমণীরই মুখনিঃসৃত অমিয়-ধ্বনি।

পাঠক! সঙ্গীত খানি শ্রবণ করুন।

অতি সুন্দর! তুমি সুন্দর!
তুমি হে বঁধু, ফুলের মধু,
তুমি হে শুধু, মধুপ প্রাণ;
তুমি হে সখা, সোহাগে আঁকা,
তুমি হে নয়নে নারীর বাণ।
অতি সুন্দর! তুমি সুন্দর!

রমণী-চুম্বিত, রঞ্জিত-লম্বিত,
কুন্দিনী-কুঞ্জে তুমি শিখী পুচ্ছ;
নারী-রূপ রাজে, তব সুখ সাজে,
হিল্লোলে দুলিছে চিকুর গুচ্ছ।
অতি সুন্দর! তুমি সুন্দর!

অনিল মৃদুল, সৌরভ লুটিল,
তব হাসি রাশি গৌরব প্রকাশে;
ইন্দু-বিন্দু ধারা, ঢালে প্রেম ধারা,
তব রূপাকাশে বিদ্যুত বিকাশে
অতি সুন্দর! তুমি সুন্দর!

চল রব দূরে, তব হৃদি-পুরে,
চল গিরী-তলে নিবে যাক্ জ্বালা ;
তটিনীর সঙ্গে, চল ভাসি রঙ্গে,
তুমিও মরিলে মরিবে বালা।
অতি সুন্দর! তুমি সুন্দর!

সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। ভাগীরথীর মৃদু তরঙ্গ ধ্বনি নীরব করিয়া, সঙ্গীতের সেই সুমোহন ঝঙ্কার, দূর অনন্ত গগনে ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গায়িকার তরণীখানি, শুরা-গাঙ্গের উপর দিয়া, কালাচাঁদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সে তরণী যে কোথায় যাইবে, কোথায় তাহার গতিরোধ হইয়া, কোন স্বর্ণতট-ভূমি আলোকিত করিবে, সঙ্গীত-পিপাসু কালাচাঁদ তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কালাচাঁদ ভূমিতল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাগীরথীর ভাসমান তরণীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, তাহার উদ্দেশে পরক্ষণে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। যাইবার সময় অস্ফুট স্বরে কি বলিয়া গেল, তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারা গেল না। বোধ হয় বলিল,—

"আবার শুনিব! ঐ সঙ্গীত আবার শুনিব!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথীর পরপারে একখানি সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতল কক্ষে, একজন খর্ব্বাকায় বিশাল-বপু-বিশিষ্ট অল্প বয়সী যুবক, সুন্দর ও সু-পট্ট পরিচ্ছদে দেহ ভূষিত করিয়া, তিনজন সহপাঠির সহিত, তিনি নানা বিষয়ক গল্প কথায় আলোচনা করিতেছিলেন।

যুবক এক একটি প্রশ্ন করিতেছিলেন, জনত্রয় তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সম্পাদন করিতে, সবিশেষ চিন্তামগ্ন হইয়া, নীরবে অবস্থান করিতেছিল।

তখন সন্ধ্যা কাল।

সন্ধ্যা-সমাচ্ছন্ন গৃহ-তলে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। সু-পরিচ্ছন্ন চন্দ্রাতপতলে দুইটি বৃহৎ ঝাড় টাঙ্গান ছিল। ঝাড়ের স্নিগ্ধ রশ্মি প্রভায়, সমস্ত গৃহ যেন আলোক মালায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। চিত্তোন্মাদিত-শক্তির বিকাশ বৃদ্ধি করিতে, বিদ্যুতালোক-সম-প্রভাবিশিষ্টা, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর নীলাম্বর বক্ষে, পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় যতই মধুর হউক না কেন, সে জ্যোতিঃ—এ দীপ জ্যোতির তুলনায় সর্ব্বাংশে হীন প্রভঃ। ইন্দ্রের নন্দন ভুবন যতই শোভা সমৃদ্ধি শালিনী নগরী হউক না কেন, তাহার গুণালঙ্কৃত কাব্য-কলায় কবি-প্রাণ যতই বিমুগ্ধ করিয়া তুলুক না কেন, এ নির্জ্জন রত্নকরোজ্জ্বল শোভাগার-বক্ষে, এ ক্ষুদ্র দীপাবলী প্রতিভায়, সে সৌন্দর্য্য-কণা যেন শত কণায় বিস্তার করিয়াছিল।

কক্ষতলে একখানি মূল্যবান্ কার্পেট বিস্তৃত ছিল। দীপালোকে সে খানি তখন উজ্জ্বল মণিমালার ন্যায় ঝল্‌মল করিতেছিল। গুটি কয়েক তাকেয়া, শুভ্র-বর্ণা-বিশিষ্টা রূপাঙ্গনা সমীপবর্ত্তিনী মানিনীর প্রায়, নাথের আসর সাজাইয়া তখন আনন্দ বাসর যাপন করিতেছিল।

"নাথ! এস হে—এস হে!—"

মানিনীর আশা পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে উপর্য্যুপরি চারিজন হৃদয়নাথ আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মান ভাঙ্গিল না। হরিষে বিষাদ ঘটিল। সুখের আনন্দ যাপন, তাহাদের পক্ষে তখন কঠিন নির্য্যাতন ভোগ উপস্থিত করিল। হায়

রে!—এ যে পিশাচের আসন। এমন পবিত্র নির্ম্মল শয্যা-বিস্তার, এমন সুপবিত্র সৌন্দর্য্যময়ী শান্তি-ভূমি, এ যে এখন পাপ স্পর্শে কলুষিত।

সুরাপায়ী, অত্যাচারী, ধর্ম্মদলিত নাস্তিকের পদস্পর্শে, এমন পুণ্য-স্থল, এমন দেদীপ্যমান, ইন্দুপ্রভাভিন্ন স্বর্গ-পুরী, এমন অনিন্দ্যিতময়ী মাধুরী-বক্ষে, এমন নিস্তব্ধ সময়ে, পিশাচের অট্ট রোলে, দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। হায় রে!—এ যে পিশাচের আসন।

পাঠক! এ অট্টালিকা ও কক্ষ কাহার জানিলেন কি? নীলকুঠির তহবিল তছরুপের দিনে, সন্ধ্যাকালে নির্জ্জন-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, দুই ব্যক্তি যে কথপোকথন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে প্রৌঢ় ব্যক্তি, যাঁহার নাম করিয়া, নোট ভাঙ্গাইবার কথা বলিয়াছিলেন, এ সেই পেশোয়া সাহেবের বাসভবন। মালিকের নাম—ধনপতি প্রেমজী পেশোয়া।

কক্ষাসীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, যিনি যুবক, নানা সাজে সুসজ্জিত হইয়া, সহাস্যমুখে যিনি গল্প কথা ব্যক্ত করিতেছিলেন, তাঁহারই নাম প্রেমজী পেশোয়া।

সেই পেশোয়া! যে পেশোয়া জাতি মহারাষ্ট্র দেশে একদিন সোনার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে পেশোয়া বাজীরাওয়ের নাম স্মরণ করিলে আজিও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, যে বংশের ইতিহাস পাঠ করিলে নর-চক্ষে অশ্রুর সীমা থাকে না, এ প্রেমজী, সেই পেশোয়া প্রেমজী! তাঁহাদেরই স্বজাতি। তাঁহারা ছিলেন—স্বর্গের দেবতা, এ প্রেমজী—নরকের কীট! তাঁহারা ছিলেন—পিপাসিতের তৃষ্ণা-বারি, এ প্রেমজী যাতনার মরুভূমি! ইহাঁর পাষাণ-বক্ষে মমতার চিহ্ন মাত্র নাই।

সন্ধ্যাকাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রেমজী গল্পের ছলে একটি

অন্যায় কথা ব্যক্ত করিয়া, স্বল্প মৃদু হাস্যে কহিলেন,—"গোবিন্‌লাল! ছেড়ে দাও; আর বাজে তর্কে প্রয়োজন নাই।"

গোবিন্‌লাল একটি অর্দ্ধবয়স্ক মাড়োয়ার। দেখিতে শুনিতে নেহাৎ মন্দ না হইলেও, সে কাফ্রি জাতির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল দেহ। কেশগুচ্ছ ভ্রমর-কুঞ্চিত থাকিলেও, মস্তকে বেশ খানিকটা টাক্ পড়িয়াছে। দূর হইতে দৃষ্টি করিলে, তাহাকে অসভ্য কাফ্রি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সে দরিদ্র! পাপকর্ম্মে সবিশেষ নিপুণ বলিয়া, তাই দরিদ্র হইলেও আজ তাহার এত অধিক সম্মান। আজ সে ধনপতি প্রেমজীর পার্শ্বাসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

প্রেমজীর কথায় গোবিন্‌লাল বেশ একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। কথাটা উড়াইবার প্রয়াসে, তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে যে ব্যক্তি বসিয়াছিল, তাহাকে একটি সজোরে ধাক্কা মারিয়া কহিল,—"পিয়ারা সাহেব! পেশোয়া সাহেব কি ব'ল্‌ছেন শোন।"

গোবিন্‌লালের ধাক্কা খাইয়া, পিয়ার সাহেবের হৃদয়ে বেশ একটু আঘাত লাগিল। সে সহসা আর কথা কহিতে পারিল না। কক্ষ-তলে পড়িয়া পড়িয়া, ক্ষীণ স্বরে অপর ব্যক্তিকে কহিল,—"মঙ্গলরাম, একটু সাম্‌লে নাও ভাই—সাম্‌লে নাও; গোবিন্‌লালের ধাক্কায় মশলা আছে।"

মঙ্গলরাম অল্পবয়স্ক যুবক। সে শশব্যস্তে কহিল,—"আঘাতটা কি খুব বেশী রকম লেগেছে।"

পিয়ারা সাহেব কহিল,—"না তুমি যে নিষ্কৃতি পেয়েছ, এই যথেষ্ট।"

মঙ্গলরাম আর কথা কহিল না।

গোবিন্‌লাল প্রেমজীর প্রতি প্রার্থনা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, মিনতি সহকারে কহিল,—"পেশোয়া সাহেব, আমাদের বেজায় বেয়াদপি।

কাজের নামে অষ্টরম্ভা, অথচ সেটাও বাগান' চাই। একটু যে চেষ্টা ক'র্‌ব, তারও উপায় নাই। বাজে ব্যাপারেই দিন কেটে গেল।"

পেয়ার সাহেব গোবনীন্‌লালের সুরে সুর মিলাইয়া কহিল,—"এই দেখুন না কেন; এক গল্পগুচ্ছ নিয়েই কত সময় নষ্ট হ'ল।"

মঙ্গলরাম পশ্চিমে খোট্টা হইলেও সেই-ই বা চুপ করিয়া থাকিবে কেন? সে বেশ একটু বুঝিয়া-সুজিয়া, গাম্ভীর্য্যতায় অথচ দেশোয়ালি চালে কহিল,—"হাঁ হাঁ, এ কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়। পেশোয়া সাহেবের আদেশ হ'লে, আমি একলাই এক শ' হ'তে পারি।"

মঙ্গলরামের এরূপ তেজস্বীপূর্ণ বাক্যে, গোবিন্‌লাল বিশেষ অপমানিত বোধ করিল। মঙ্গলরাম এগার টাকা বেতনের একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী, আর গোবিন্‌লাল সে—দলের সর্দ্দার। তাহার উচ্চ বেতন ও সম্মান অধিক। উপস্থিত ক্ষেত্রে স্ব-গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত, দাম্ভিক ভরে সে কহিল,—"সে কথা ছেড়ে দাও; আমিই কোন না পাঁচ শ' হ'তে পারি।"

পেয়ার সাহেব কহিল,—"আহা হা, আমিও ত' তাই বলি। পেশোয়া সাহেব যদি একটু ইঙ্গিত করেন, তা হ'লে এমন সোণার মুলুকের একদিনে তোলপাড় ক'রে তুল্‌তে পারি।"

প্রেমজী তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারীগণের কথা শুনিয়া, আনন্দিত মনে কহিলেন,—"দেখ তোমাদের যে অসীম অনুরাগ ও অকুতো সাহস, সেটা আমি অনেকদিন পূর্ব্বেই জেনেছি। পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়ে, সেই নারী চুরীর ব্যাপারটা যেদিন সাফ্ উড়িয়ে দিয়েছিলে, সেই দিনই বুঝেছি যে, তোমরা সামান্য নয়; তোমাদের সুচতুর বুদ্ধির কাছে, উকিলের ওকালতিও হার মেনে যায়। কি বল গোবিন্‌লাল! আমি কি মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছি?"

গোবিন্‌লাল তাহার যুগল করদ্বয় একত্রে সংরক্ষিত করিয়া, বেশ

অম্ল-মধুর, অথচ শান্তভাবে কহিল,—"সে পেশোয়া প্রেমজী সাহেবের অনুগ্রহ। আপনার অনুগ্রহ বলেই আমরা এতটা ক'র্‌তে সাহস পেয়েছি।"

প্রেমজী গোবিন্দলালের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"স্বীকার ক'র্‌লুম, না হয় আমি তোমাদের টাকার মালিক; কিন্তু কাজের কিছুই নয়। কার্য্যগুণে তোমরা আমায় সর্ব্বরূপেই পরাস্ত ক'রেছ। আমি তোমাদের কাছে চিরদিনই হার স্বীকার ক'রে আস্‌ছি। এ ক্ষেত্রে আজও তাই ক'র্‌লুম।"

জনত্রয়ের ভিতর হইতে একটা হাহা সোরগোল উঠিল। তাহারা সমস্বরে ও উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"তাও কি কখন হ'তে পারে? তাও কি কখন হ'তে পারে?"

উচ্চ জনরব-পূর্ণ সুসজ্জিত কক্ষ তখনও নীরব হয় নাই। সকলেই উচ্চ-হাস্যে রত। এমন সময় কক্ষদ্বারের সম্মুখে, একটি বেশ রূপবান্ বাঙ্গালী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবুটির চাল-চলন দেখিয়া অনুমানে বুঝাইল, তিনি বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন; বাপের বোধ হয় দু-দশ টাকার সম্পত্তি আছে।

পায়ে বিলাতী বার্ণিসের পম্প সু। পরিধানে ঢাকার মিহি সুতার ধুতি। গায়ে মূল্যবান আল্‌পাকা কাপড়ের অঙ্গরাখা, ইহার উপর সিল্কের চাদর, আংটি, ঘড়ি ও চেন, এ সব ত' আছেই; আবার হাতে একখানি সৌখিনী ধরণের ছড়িও শোভা পাইতেছে।

তিনি যুবক। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র কি ভাবে গঠিত, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি অতি সুপুরুষ। তাঁহার মস্তকের সুচিক্কণ ও কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, তাঁহাহ দীর্ঘ বলিষ্ঠকায় অঙ্গ-সৌষ্ঠবের শোভা-সম্পদ আরও শতগুণে পরিবর্দ্ধন করিতেছিল। তিনি সুন্দর! অতি সুন্দর!

দিবসের মধ্যাহ্ন-যোগে, সে দিন সেই নির্জ্জন পল্লীভূমি ধ্বনিত করিয়া, পুণ্য গঙ্গার শ্বেতবারি-বক্ষে, ভাসমান ক্ষুদ্র তরণী-অঙ্কে, সে দিন যে নারী পঞ্চমে রাগিণী তুলিয়া গাহিয়াছিল,—

"অতি সুন্দর! তুমি সুন্দর!"

এই আগন্তুক যুবক বোধ হয়, সেই সুন্দরেরই সুন্দর! বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তাই। ইহার নাম যামিনীনাথ সরকার। নীল-কুঠীর অপহৃত ব্যাপারের মধ্যে, ইনি একজন প্রধান। কুঠীর-প্রাঙ্গণে প্রৌঢ় ব্যক্তি যাঁহার হস্তে বিশ হাজার টাকার নোট্ দিয়া-ছিলেন, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, এক নিঃশেষে পথের বাহির হইয়া, যিনি জলপথে প্রস্থান করিয়াছিলেন, ইনি সেই যুবক।

যামিনীনাথকে সম্মুখে দেখিয়া, প্রেমজীর অন্তর-ভূমি যেন টলমল করিয়া উঠিল। মোহের বিকারে ও মনের উল্লাসে, সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার সানন্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল। অতি কষ্টে মনাবেগ সম্বরণ করিয়া তিনি কহিলেন,—"এই যে, যামিনী বাবু!"

যামিনীনাথ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে প্রেমজীর পার্শ্বস্থান অধিকার করিলেন।

প্রেমজী পুনরায় কহিলেন,—"সংবাদ কি?"

যামিনীনাথ কহিলেন,—"সুমঙ্গল!"

প্রেমজী। মিথ্যা কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আপনি বোধ হয় আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'র্‌ছেন।"

যামিনীনাথ মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, একটু গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"কেন?"

এ 'কেন' উক্তির বেশ একটু তাৎপর্য্য ছিল। ইহাতে প্রেমজী পেশোয়ার হৃদয়ে কেন যে বিষাদের মলিন-রেখা ফুটিয়া উঠিল, কেন যে তাঁহার চক্ষে অশ্রুকণা বিগলিত হইল, তাঁহার প্রাণ কেন যে

নীরবে কাঁদিল, তাহা তিনিই জানেন! সে কথা তিনিই ব্যক্ত করিতে পারেন।

প্রেমজীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। বুক সত্য সত্যই ফাটিল, কিন্তু মুখ ফুটিল না। তিনি মনের আবেগে কত কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন, কালক্রমে তাহা পারিয়া উঠিলেন না। তাঁহার উৎসাহ কমিয়া আসিল! সঙ্কল্প—বিকল্প হইল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! আমার অন্তরের অব্যক্ত ভাব ও ভাষা, এ যে প্রকাশ করবার নয়; এ কথা কে শুন্‌বে! কেই বা বিশ্বাস ক'র্‌বে! যামিনীনাথ? না, সে ত' হবে না, সে যে হবার নয়। তিনি যদি বুঝ্‌তেন, আমার হৃদয় জ্বালার তিনি যদি কিয়দংশ অনুভব ক'র্‌তে পার্‌তেন, তা' হ'লে এতদিনের মধ্যে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হ'ত। তুচ্ছ নারীরূপে মুগ্ধ ব'লে, দুর্ভাগ্য পেশোয়াকে আজ এ যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হ'ত না। হায় রে! এ যে প্রেমের নেশা। আমি যে এখন প্রেম-মদিরা পানে বিভোর।"

ভাবনার পর ভাবনা আসিয়া প্রাণে প্রাণে কতই ঘাত-প্রতিঘাত করিতে লাগিল। উপাচার নষ্ট হইল, প্রতিমা বিসর্জ্জনে গেল; কিন্তু প্রতিক্ষেপ তখনও বর্ত্তমান রহিল।

প্রেমজী পুনরায় ভাবিলেন, "আমার যখন পূজা সিদ্ধি হ'ল না, তখন নিরাশায় থাকি কেন? বক্ষ:-পঞ্জর উন্মুক্ত ক'রে রেখেছি, হৃদয়-বিহঙ্গিনী যখন এল' না, তখন সে চিন্তায় আর প্রয়োজন কি? সে ব্যর্থ চিন্তা! সে বিফল কামনা!" মনে মনে এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি অন্যভাবে কহিলেন,—"যামিনী বাবু! আপনি যে দেখা দিতে পেরেছেন, এই যথেষ্ট।"

যামিনীনাথ বলিলেন—"কেন, এমনটা কি কোন দিন হয় না? নেহাৎ কাজের তাড়া তাই দু'দিন আস্‌তে পারিনি।"

প্রেমজী। তা বেশ—বেশ ; এমনি হ'লেই সব দিক রক্ষা হবে।

যামিনীনাথ। আমি সবই রক্ষা ক'রে যাচ্ছি।

প্রেমজী। সে আপনিই জানেন।

যামিনী। তা জানি বটে ; জানি ব'লেই তাই আপনাকে জানাতে এলুম।

প্রেমজী। বিষয়টা কি ?

যামিনী। কামিনী ও কাঞ্চন। কাঞ্চন যখন রাশি রাশি, তখন কামিনী চাই। এইবার তারই পালা।

প্রেমজীর মলিন বিবর্ণ-মুখ-মণ্ডল প্রফুল্ল শতদলের ন্যায় হাসিয়া উঠিল। তিনি শশব্যস্ত ভাবে কহিলেন,—"বলেন কি যামিনী বাবু! আমি যে তাই-ই চাই! এ দুনিয়ায় দুনিয়াই যে আমার প্রার্থনীয় বস্তু।"

দুনিয়া একটী মুসলমান কন্যা। দুনিয়া দস্যু-নন্দিনী—পিশাচিনী। যামিনীনাথ নীলকুঠীর পশ্চাৎপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, যে দুনিয়ার নাম স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"দুনিয়া এসেছে" এ রমণী সেই দুনিয়া। রূপৈশ্চর্য্যময়ী ষোড়শীবালা, রূপে গুণে জগতের অদ্বিতীয়া, তত্রাচ দুনিয়া পাষাণী। রূপের ফাঁদে ফেলিয়া, প্রেমজীর ন্যায় সুচতুর ব্যক্তিকে, আজ বৎসরাবধিকাল ধরিয়া, সে নানা রকমে জ্বালাতন করিয়া আসিতেছে। কখন প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে ছুটিয়া আসিতেছে, কখন নিরাশ অন্ধকার বক্ষে লইয়া, নিরাশ প্রেমিকের পবিত্র-প্রেমাশা নিরাশ করিতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছে, আবার কখন বা সকলই বিফল! কিছুই নাই—কিছুই নাই। পাষাণ-হৃদয়! সে হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুশ মাত্র নাই।

দুনিয়ার মত পরিবর্ত্তন দফায় দফায়, কিন্তু প্রেমজীর তাহা নহে ; প্রেমজী তাহাকে কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে ভুলিতে

চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা তাঁহার বিফলেই যায়! ফলে কিছুই দাঁড়ায় না।

যামিনীনাথের মুখে কামিনীর নাম শুনিয়া, কামোন্মত্ত প্রেমজী আর সুস্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহিতে লাগিলেন,—"যামিনী বাবু, আমায় বাঁচান!—আমায় বাঁচান। দুনিয়ার ভাবনা ভেবে এ হৃদয় খালি হ'য়ে গেছে। তার জন্যে আমি মর্‌তে ব'সেছি।"

যামিনীনাথ কহিলেন,—"ভয় কি!—সে আপনারই আছে।"

প্রেমজী। এ কথা বিশ্বাস হয় না।

যামিনী। কেন, আপনি কি আমায় অবিশ্বাস ক'র্‌ছেন?"

প্রেমজী। না! তবে কতকটা তাই বটে।

যামিনী। সে আপনার মনের ভ্রম। আমায় বিশ্বাস করুন। আপনার শীঘ্রই সুফল ফ'ল্‌বে।

প্রেমজী। না, সে বিশ্বাস অনেকবার ক'রেছি। আর না যামিনী বাবু! সে কথা আর মুখে আন্‌বেন না। দুনিয়া আপনাদের অধীনা ব'লে, আপনাদের বিশ্বাসে আত্মনির্ভর ক'রে, অনেক কুকর্ম্ম ক'রেছি। দুনিয়াকে আপনারা হরণ ক'রে এনেছেন, আর আমি তার জীবিত স্বামীকে, তার সম্মুখে স্বহস্তে হত্যা ক'রেছি। কেবল তার জন্যে এমন কাজ ক'রেছি। কেবল তাকে একটিবার হৃদয়ে রাখবার জন্যে এ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'য়েছি।

যামিনী। সে কথা ছেড়ে দিন। যা হ'বার হ'য়ে গেছে, এখন থেকে জেনে রাখুন, যে দুনিয়া আপনারই জীবন-সঙ্গিনী।

প্রেমজী। কি ক'রে তা বিশ্বাস ক'রব বলুন? এ প্রলোভন ত' আপনারা আমায় প্রত্যহই দেখিয়ে থাকেন। সে দিন কুড়ি হাজার টাকার নম্বরী নোট ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেলেন, ব'লে গেলেন, "কালই

দুনিয়াকে হাজির ক'র্‌ব।" সে কাল ছেড়ে কত দশ বিশটা কাল চ'লে গেল, তত্রাচ সে আমার হ'ল না। এ কদিনের মধ্যে আপনারও সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। দুনিয়াকে ভালবাসি ব'লে, দুনিয়া-প্রেমে প্রেমজীর প্রাণ ভরপুর হ'য়ে গেছে ব'লে, আপনারা তাই আমায় শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত ক'চ্ছেন। যে ধারে যখন তাড়াচ্ছেন, উন্মাদের ন্যায় বিদ্যুৎ-বেগে আমি তখন সেই ধারেই ছুটে যাচ্ছি। যামিনী বাবু! আমায় মার্জ্জনা করুন। প্রমাণ ব্যতীত সে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।"

যামিনী। কি প্রমাণ চান?

প্রেমজী। হয় দুনিয়ার সম্মুখ সাক্ষাৎ, নয় তার হস্তলিপি। এই দুটোর একটা না একটা অবশ্যই চাই।

যামিনী বাবু তাঁহার ভিতরের অঙ্গরাখা হইতে, একখানি ক্ষুদ্র লিপি বাহির করিয়া, জলদ-গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"বেশ, এই নিন! দেখুন এ লিপি দুনিয়ার হস্তাক্ষর কি না?"

প্রেমজী কম্পিত হস্তে যামিনীনাথের প্রদত্ত লিপিখানি গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলেন, যে যামিনীনাথের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ধারণা তাঁহার অচিরে বিনষ্ট হইল। হায় রে! এ যে তার'ই হস্তলিপি! এ অমিয় বর্ষিত—ভাষা বিনিন্দিত—প্রেম-রহস্য-পূর্ণ গভীর তত্ত্ব লেখনী মুখে, এ ক্ষুদ্র লিপিখণ্ড ব্যাপৃত করিয়া, এ অনুনয় যে দুনিয়ারই অঙ্কন চিত্র। প্রেমজী লিপি খানি খুলিয়া দেখিলেন, যে সে লিপি সত্য সত্যই দুনিয়া কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। সে ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য যে সমস্ত লিপি পাঠাইয়াছিল, এখানি ঠিক তাহারই অনুরূপ। ভাব, ভাষা ও অক্ষর কিছুরই গরমিল নাই।

লিপিখানির আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া, প্রেমজী আর নীরবে

থাকিতে পারিলেন না। তিনি উন্মত্তের ন্যায়, বিচলিত ভাবে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আরক্ত গণ্ড-তল সিক্ত হইয়া, তখনই সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ-ধারা নির্ঝর হইতে লাগিল। বক্ষঃস্থল দুরু দুরু কম্পিত হইল। বিষাদ-তমসাচ্ছন্ন হৃদ্‌-গগনে আনন্দ-চন্দ্রের উদয় হইল। নিরাশ নয়ন-পথে, নৈরাশ্যের মলিনত্ব ভেদ করিয়া, আশার নবীনালোক ফুটিয়া উঠিল। সংসার সুখের হইল। কামনা স্বর্গের সীমানায় দাঁড়াইল। জয়—প্রেমের জয়! জয়—প্রেমের জয়!!

প্রেমজী লিপিখণ্ড খানি দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ আবদ্ধ করিয়া, নব-হর্ষোৎফুল্ল মনে কহিলেন,—"যামিনী বাবু! আপনি আমার বড়ই উপকার ক'র্‌লেন। যে নারীর নিমিত্ত দীর্ঘজীবন নীরবে কেঁদে এসেছি, যার মুখাপেক্ষী হ'য়ে, এমন সুখের সংসার অকাল-স্রোতে ভাসিয়ে দিতে ব'সেছি, সেই দুনিয়া, সেই রূপের পসরা, সেই আসমানের চাঁদ, আমার হস্তগত হ'ল। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন! আজ আমি বড়ই সুখী।"

যামিনীনাথ সহাস্যে কহিলেন—"সে আমাদের সৌভাগ্য।"

প্রেমজী কহিলেন;—"পরম সৌভাগ্য। আজ আপনার প্রত্যাবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব! একটু আমোদ ক'র্‌তে হবে। এই বিষাদ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত নীরব-কক্ষতল, একটু আনন্দ কোলাহলে মুখরিত ক'র্‌তে হবে। কেমন, আপনি কি বলেন?

যামিনীনাথ একটু অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন,—"আজ্ঞে আজ আমার একটু প্রয়োজন আছে।"

প্রেমজী। সে কথা কাল হবে। আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না।

প্রেমজীর আদেশ মত তৎক্ষণাৎ ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরার বোতল আসিল, ডিবা ভর্ত্তি পান আসিল, সট্‌কা আসিল,

আরও আরও কত কি খাদ্য দ্রব্য আসিল। দেখিতে দেখিতে অল্প-ক্ষণের মধ্যে, সে সমস্ত দ্রব্য সম্ভারে, কক্ষতল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রেমজী সুরা ঢালিতে লাগিলেন। সকলেই প্রায় সুরা পানে বিভোর হইলেন। আর অল্পক্ষণ পরে, কে যে কোথায় শয্যা গ্রহণ করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

পাঠক! আসুন, এই অবসরে আমরা একবার লিপিখণ্ড খানি পাঠ করিয়া দেখি। যে লিপি পাঠান্তে, প্রেমজী পেশোয়ার মনে আজ এত আনন্দোদয়, সে লিপিখানি অবশ্যই পাঠ্য-যোগ্য।

লিপির মর্ম্ম এইরূপ,—

প্রাণের প্রেমজী!

"আশা করি আপনি আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাকে প্রকৃতই ভালবাসি। পূর্ব্বে যে সামান্য অভিমান করিয়াছিলাম, যে কারণে আপনার ন্যায় দেবতাকে উপেক্ষা করিতে সবিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম, সে চিন্তার ফলে, আজ আমায় অহর্নিশি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। সে চিন্তার কথা অবর্ণনীয়।

আপনি আমার পতি-হন্তা। মনে করিয়াছিলাম, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আপনাকে হত্যা করিব। আপনার বক্ষঃ শোণিতে, আপনারই স্ব-রাজ্য সিক্ত করিব। আপনার সুসজ্জিত বিলাস-কক্ষ, উষ্ণ রক্তাপ্লুত করিয়া, আপনার শবদেহ-বক্ষে উপবেশন করিয়া, আপনার নীরব কক্ষ, পিশাচীনীর ন্যায় অট্টহাস্যে কম্পিত করিয়া তুলিব। পতি হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। কিন্তু, তাহা আর হইল না; মনের সে সঙ্কল্প তৃণ, কাল-স্রোতে অতল জলে ভাসিয়া গেল। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলাম না।

পেশোয়া সাহেব! আমি এখন আপনাকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে চাই। সদয়-চিত্তে অভাগিনীর আশা পূর্ণ করুন। যবন-নন্দিনী

বলিয়া, আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না। চরণাশ্রিত কিঙ্করীকে চরণে স্থান দিন। সুযোগ্য—সুমাঙ্গবর প্রেমজী পেশোয়ার নিকট আমার এই প্রার্থনা। এই নিবেদন। ইতি—

আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী,—

তুনিয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। জল, ঝড় ও বজ্রাঘাতের কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। ঝড়ের বেগটা অত্যন্তই প্রবল ছিল বলিয়া, সেই কারণে কর্দ্দমক্ত পথিমধ্যে দুই একটি বৃক্ষও ধরাশায়ী হইয়াছে। এক দিকে পথের অবস্থা যেমন, অন্যদিকে তেমনি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোরম কুঞ্জ-নিচয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বাত্যা-দলিত শতদল, মৃণালচ্যুত হইয়া জলস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির বেগ কমিয়াছে, কিন্তু বায়ু-বেগ এখন সমানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পল্লী-সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে, পবন-পদ-লুণ্ঠিত বৃক্ষশাখা, ভূমিতলে পড়িয়া পড়িয়া, রাজপথে এখন আবর্জ্জনা পূর্ণ করিতেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বর্ষার শীতল বায়ু, বিশাল বারি পূর্ণ সরসী-বক্ষ স্পর্শ করিয়া, ধীরে ধীরে বিশাল ধরাতল সুশীতল করিতে লাগিল। নীলকুঠীর ঘণ্টায় ঘা পড়িল। ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল, কিন্তু প্রকৃতির দুর্য্যোগ অন্ধকার তখনও ঘুচিল না। মেঘাচ্ছন্ন ভীষণ অন্ধকার যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। নীলকুঠীর সদর ফটকের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ

একখানি প্রকাণ্ড গৃহে, জনকয়েক হিন্দুস্থানী দ্বারবান্, তখন সমস্বরে ভজনগীতি গাহিতেছিল। দুইজন সশস্ত্র পুলিশ-কনেষ্টবল, বৃহৎ ক্যাস-ঘরের সম্মুখে সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত ছিল। তহবিল তছরুপের পরবর্ত্তী কাল হইতে, ডিটেকৃটিভ গরিজান, এ স্থানে এইরূপ ভাবেই পাহারা নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

কুঠীর নিম্নতলে এতগুলি লোক রহিয়াছে, তথাপি উপরিতল যেন একেবারেই জনশূন্য। উপরের একখানি সুসজ্জিত কক্ষে, দুই জন ব্যতীত আর কেহই নাই। একজনের নাম মহম্মদ গরিজান, আর একজনের নাম, জন বেকার।

পাঠক! উপরোক্ত উভয় ব্যক্তিকে আপনি বোধ হয়, বিশেষরূপ চিনিতে পারিয়াছেন। জন বেকার যে নীলকুঠীর হর্ত্তাকর্ত্তা, আর গরিজান যে একজন বিখ্যাত ডিটেকৃটিভ, সে কথা আর দ্বিতীয় দফায় জানাইতে হইবে না। আশা করি, ইহার কারণ লেখকের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

জন বেকার তখন সেই কক্ষমধ্যে নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন। আর গরিজান তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে—অপর একখানি চেয়ারে বসিয়া, একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় পুনরায় বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রবল-বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টিধারা ক্রমেই যেন মুষলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল।

গরিজান সংবাদ পত্রখানি যথাস্থানে রাখিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন,—"বৃষ্টি কি আজ আর বন্ধ হবে না?"

সাহেব কহিলেন,—"না হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? আপনার আজ বাড়ী যাওয়া হবে না।"

গরিজান। কেন, আপনি কি আমায় কিছু পুরস্কার ক'র্‌বেন?

সাহেব। না, সে সামর্থ্য আমার অতি অল্প। তবে আমার তহবিল চুরির যে দিন সঠিক মীমাংসা হবে, সেই দিন আপনাকে দশ হাজার টাকা অর্পণ ক'র্‌ব।

গরিজান মনে মনে হাসিয়া কহিলেন,—"ব্যাপার যে রকম দেখ্‌ছি, এতে যে খুব শীগ্‌গির গোল মিট্‌বে এমন ত' বোঝায় না। দিন দিন ঘটনাটা যেন ক্রমেই জটিলতা পূর্ণ হ'যে দাঁড়াচ্ছে।

সাহেব। অনুসন্ধানে কি কিছু ফলোদয় হ'চ্ছে না?

গরিজান। না। কত চেষ্টা ক'চ্ছি, কত রকম ফন্দি আঁটছি, কিন্তু ফলে কিছুই দাঁড়াচ্ছে না। ধ'রেও ধ'র্‌তে পাচ্ছি না।

সাহেব। আপনি এখন কাকে ধ'র্‌তে চান?

গরিজান। আপনার বিশ্বস্ত কেসিয়ার মৌলবীজানকে।

সাহেব। কেন, আপনার মতে সেই-ই কি প্রকৃত চোর?

গরিজান। নিশ্চয়ই, তার আর কোন সন্দেহ নাই।

সাহেব। কিরূপে তা জান্‌লেন?

গরিজান। অনুসন্ধানে তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি।

সাহেব। তাই যদি সত্য হয়, তা হ'লে এখন তাকে গ্রেপ্তার করেননি কেন? সে ত' আমাদের চোখের সামনেই র'য়েছে।

গরিজান। কোথায় বলুন দেখি?

সাহেব। ছুটি নিয়ে মুর্শিদাবাদ গেছে। আমার বোধ হয় সে এখন সেই খানেই র'য়েছে। সেই খানে তার মাসীর বাড়ী।

গরিজান। মিথ্যা কথা। মুর্শিদাবাদে তার কোন আত্মীয় নাই।

সাহেব। আপনি কি ব'ল্‌ছেন! সে যে প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করে থাকে। কেউ যদি নাই, তবে দশ বার দিন যাবৎ সেখানে সে কি ক'র্‌ছে? কার আশ্রয়ে আছে।

গরিজান। তা জানি না; কিন্তু সে কখন মুর্শিদাবাদে যায়নি।

সাহেব। বলেন কি! তবে কোথায় গেছে?

গরিজান। অনুমান হয় এই মুঙ্গেরেই আছে।

সাহেব। বুঝেছি। তা হ'লে সে এখন পলাতক আসামী, কেমন?

গরিজান। হাঁ, এইবার বুঝ্লেন ত'?

সাহেব। এখন ঠিক বুঝ্তে পাচ্ছি না। মৌলবীজান যে চোর হবে, এ স্বপ্নের অগোচর।

গরিজান। কালচক্রে এই রকমই হ'য়ে থাকে।

এই কথা বলিয়া, গরিজান তাঁহার সম্মুখস্থ মারবেল টেবিল হইতে. পূর্ব্ব-রক্ষিত সংবাদপত্র খানি হাতে লইয়া, তাহা নীরবে পাঠ করিতে লাগিলেন। বেকার সাহেব নীরব হইলেন। এমন সময় খান্সামা আসিয়া উভয়ের সম্মুখে চা পূর্ণ পেয়ালা রাখিয়া, সে আবার বাহিরে চলিয়া গেল।

সাহেব একটি পেয়ালা স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া কহিলেন,—"চা খান।"

গরিজান সাহেবের আদেশ মত চা পান করিতে লাগিলেন।

তখনও উভয়ের পেয়ালা শূন্য হয় নাই। উভয়েই চা পানে রত। অকস্মাৎ বৃহৎ অট্টালিকা কম্পিত করিয়া, নিম্নতলে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে দুই তিনটা পিস্তলের আওয়াজ হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জন দুই দ্বারবান. উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল,—"শালা ডাকু হ্যায়! শালা ডাকু হ্যায়!"

কি ভীষণ ব্যাপার! অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, এ সময় এ কি সর্ব্বনাশ! এ সর্ব্বনাশ কে করিল? এমন ভয়াবহকর বজ্রাঘাত করিতে, এমন নব-শান্তি স্থাপিত, এমন সশস্ত্র পুলিশ সংরক্ষিত দৃষ্টি-সীমার মধ্যে, এমন শত্রুতা-ব্রত সম্পাদন করিতে, কে প্রবেশ করিল?

ব্যাপার দেখিয়া বেকার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। তাঁহার হস্তস্থিত চা পূর্ণ পেয়ালাটি, ভূমিতলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া

গেল। হতভম্বের ন্যায় গরিজানের মুখের প্রতি তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

গরিজান একজন বিখ্যাত ডিটেক্টিভ। তিনি অসীম সাহসী ও বল-বিক্রমশালী পুরুষ। এ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হওয়াতে, তিনি বিশেষ চিন্তা করিলেন না। সাহসে আত্ম-নির্ভর করিয়া কহিলেন,—"ব্যাপার বড়ই গুরুতর। চলুন একবার দেখা যাক্।"

বেকার সাহেবের মুখে এতক্ষণ কোনই কথা সরিতে ছিল না। গরিজানের সাহসে বল পাইয়া তিনি কহিলেন,—"রিক্ত হস্তে গৃহত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। এ ব্যাপার নিশ্চয়ই দস্যু-তস্করের দ্বারা সঙ্ঘটিত হ'চ্ছে।"

গরিজান কহিলেন,—"তাতে আর আপত্তি কি?"

সাহেব। উহারা নিশ্চয়ই সশস্ত্র। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি নিরস্ত্র ভাবে বদমাইস-দলের সম্মুখীন হই, তা হ'লে হয় ত' জীবন-সংহার উপস্থিত হ'তে পারে।

গরিজান। সে ভার আমার উপর। অস্ত্রের যদি প্রয়োজন হয়, তা হ'লে সে আমার কাছে যথেষ্টই আছে।

উপরোক্ত কথা সমাপ্ত করিয়া, গরিজান তাঁহার আজানুলম্বিত চাপকানের গুপ্ত স্থান হইতে, একটি ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সের মধ্যে দুইটি ছয়নলা পিস্তল, গুটিকতক কার্টিজ, একখানি শাণিত ছোরা ও একটি ক্ষুদ্র শিশিতে যৎসামান্য ক্লোরাফরম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সমস্ত দ্রব্য গুলিই বাক্সের মধ্যে রহিয়া গেল, বাহির হইবার মধ্যে, কেবল পিস্তল দুইটি বাহির হইল। একটি পিস্তল তিনি নিজের হস্তে লইলেন, এবং অপরটি বেকার সাহেবের হস্তে দিয়া কহিলেন,—"এই নিন্, এতে কার্টিজ ভর্ত্তি আছে।"

সাহেব সবিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"আমায় কি ক'র্‌তে হবে ?"

গরিজান। আপনাকে কিছুই ক'র্‌তে হবে না। প্রয়োজন হ'লে, পিস্তলটি আপনার আত্মরক্ষার সম্বল। চলুন, একবার নিম্নতলে যাওয়া যাক। ব্যাপার বোধ হয় বড়ই গুরুতর।

সাহেব। কি রকম বুঝ্‌ছেন ?

গরিজান। ঘটনাস্থলে না গেলে কিছুই ব'ল্‌তে পারি না।

গরিজান আর মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিলেন না। সাহেবকে সঙ্গে করিয়া, তিনি দ্রুতপদক্ষেপে গৃহত্যাগ করিলেন।

নিম্নতলে একটা মহা রৈ রৈ ব্যাপার চলিতেছিল। দ্বারবানগণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, ক্যাসঘরের অদূরে কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। এতাবৎ সময় জন বেকার ও মহম্মদ গরিজান তথায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, দুই জন দ্বারবান উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"হুজুর! আদ্‌মি কো জান লে লিয়া।"

বেকার সাহেব প্রথমতঃ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। গরিজানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যখন তিনি ক্যাস-ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন ক্ষীণ দীপালোকের সাহায্যে দেখিলেন, যে গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত। দ্বারের সম্মুখে রক্ত-স্রোত বহিতেছে। একটি পুলিশ কর্ম্মচারী, বজ্রাহত পথিকের ন্যায় ভূমিতলে পড়িয়া, তখনও সে ধীরে ধীরে হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছিল। কি ভীষণ দৃশ্য! কি বিস্ময়কর ঘটনা! এ ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া, সাহেব আর নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। মস্তকে হাত দিয়া তিনি ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন।

সাহেবকে সবিশেষ মর্ম্মাহতভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, গরিজান

কহিলেন,—"মিঃ বেকার! অতটা অধীর হ'লে চ'ল্‌বে না। যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দিন।"

সাহেব কহিলেন,—"কি ব'ল্‌ছেন ?"

গরিজান। ক্যাসে কি কিছু ছিল ?

সাহেব। যথেষ্টই ছিল।

গরিজান। কত টাকা ?

সাহেব। পঞ্চাশ হাজার।

গরিজান। নগদ টাকা, না নোট ?

সাহেব। সবই এক শ' টাকার নোট। মহম্মদ সাহেব! এইবার আমার সর্ব্বস্ব গেল; এইবার আমি পথের ভিখারী হ'লুম।

গরিজান। সে আক্ষেপের অনেক সময় আছে। এখন কাজের কথা যা তাই হ'ক।

কনেষ্টবলদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি ঘটনা স্থলের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া, স্বীয় অদৃষ্টকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছিল, গরিজান তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন,—"ব্যাপার কি ?"

কনেষ্টবল কহিল,—"হুজুর! বড়ই ভীষণ।

গরিজান। সে বিষয় আমি বুঝ্‌ব। উপস্থিত কি ভাবে কি হ'ল, তাই ব্যক্ত কর।

কনেষ্টবল। আমরা উভয়ে পাহারায় নিযুক্ত ছিলুম। বৃষ্টিটা যখন খুব জমকে এল, এমন সময় পিছন দিক থেকে, জন কতক বলবান্ ব্যক্তি এসে, আমাদের উভয়কেই বেঁধে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌ল। আমরা চেঁচাবার চেষ্টা ক'র্‌লুম, কিন্তু তারা আমাদের মুখে কাপড় চাপিয়া ধরিল, এবং কহিল,—"সাবধান! একটি কথা বল্‌বি কি এই পিস্তলের সাহায্যে তোদের মাথা ভাঙ্গ্‌ব'।" তাদের সকলেরই হাতে এক একটা পিস্তল ছিল।

গরিজান। কি রকম পিস্তল ?

কনেষ্টবল। খুব বড় বড়।

গরিজান। হুঁ, তার পর কি হ'ল ?

কনেষ্টবল। আমরা আর কথা ব'লতে পারলুম না। তাদের ভিতরে এক জনের কাছে এক তোড়া চাবি ছিল। সে ব্যক্তি অতি শশব্যস্ত ভাবে ঘরের তালাটি খুলিল, এবং মিনিট তিন পরে ঘরের বাইরে এসে ব'ল্লে,—"চল, কাজ হাঁসিল হ'য়েছে।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উভয়কে ছেড়ে সকলেই তখন পলায়নপর হইল। আমরা বাধা দিতে চেষ্টা ক'রলুম, কিন্তু তাতে দস্যুরা পিস্তলের আওয়াজ করে, আমার জুড়িদারকে মা'রলে। আমি আর কি ক'রব, প্রাণ রক্ষার জন্যে তখন একটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্লুম।

গরিজান। দ্বারবানেরা কোথায় ছিল ?

কনেষ্টবল। ওরা ওদের ঘরে ছিল।

গরিজান। তোমাদের পিস্তল কোথায় ?

কনেষ্টল। পিস্তল তারা প্রথমেই কেড়ে নিয়েছে।

গরিজান। যাক্, আপদ মিটেই গেছে। চল এখন একবার ক্যাস-ঘর খানা পরীক্ষা ক'রে দেখি।

গরিজান আর অন্য বাক্যব্যয় না করিয়া, তিনি ক্যাস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বৃহৎ আইরন্‌চেষ্টের ডালা উন্মুক্ত। তাহার মধ্যে কিছুই নাই। গৃহের চারিপার্শ্ব বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

সাহেব তাঁহার প্রতি আকাঙ্ক্ষা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"কি দেখ্‌লেন, কিছু রেখে গেছে কি ?"

গরিজান। না, সবই শূন্য ক'রেছে। দেখুন, আমি এখনি চল্লুম। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, দু চার জন পুলিশ পাঠিয়ে

দিচ্ছি। আর এই আহত ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য, ডাক্তার রবার্টসন্‌কে আমি এখনি পাঠিয়ে দিব। আপনারা সকলে নির্ভয়ে থাকুন। উপস্থিত ক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ নাই।

এই কথা বলিয়া, ডিটেক্‌টিভ গরিজান নীলকুঠী পরিত্যাগ করিয়া, অনতিবিলম্বের মধ্যে তিনি পথের বাহির হইয়া পড়িলেন। আর জন বেকারের হৃদয় তখন একটা প্রগাঢ় চিন্তায় অভিভূত হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"যুবক! তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি চাও কি?"

"মহাশয়! আমি অতি দরিদ্র। আপনার নিকট একটা চাকুরীর প্রত্যাশায় এসেছি।"

"ওঃ—তা বেশ; আমার সদর কাচারীতে অনেক লোকের দরকার আছে। চাকুরীর অভাব নাই।"

প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া বেলা আন্দাজ সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। ফাল্গুন মাস তখনও শেষ হয় নাই। সে দিন মাসের আটাশে তারিখ। নব-বসন্ত-বিকসিত ধরাতলোপরি, ঊষার সুশীতল সমীরণ তখন ধীর-মন্থরাগমনে, বিশ্ব-চরাচর বিস্তার করিতেছিল। নব-পল্লব পরিশোভিত কুসুমোদ্যানে, অলিকুল-মুখরিত মধুর সুতানে, মর্ম্মস্থল-ভেদী করুণ রসোচ্ছ্বাসে, ভাবুকের হৃদয় তখন সত্য সত্যই আর্দ্র করিয়া তুলিতেছিল।

তখন ছোট ছোট সুকুমার বালকেরা, গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া কত রকম নূতন নূতন খেলার সৃষ্টি করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে, কেহ হাসিতেছিল, কেহ নাচিতেছিল, কেহ বা বালু-কণা বিস্তৃত সমতল

ক্ষেত্রোপরি, দুই একজন সহপাঠী সঙ্গী করিয়া, মদোল্লাসে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করিতেছিল। তখন পূর্ণ-বয়স্ক তরুণ যুবক, পূর্ণ-যৌবন-ভারাক্রান্ত হৃদয়খানি লইয়া, পবিত্র প্রেমের সাধনায় আত্ম-নিয়োজিত করিয়া, ফুল্ল-নলিনী-নিকুঞ্জে প্রকৃতি সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। আর সেই সময়ে, সেই প্রশান্তরূপিণী মেদিনী-বক্ষে, সেই রবিকরোজ্জ্বল স্বচ্ছস্থিত গঙ্গা-জলোচ্ছ্বাসে, সেই সুদূর গঙ্গা-তটভূমি প্রোজ্জ্বল করিয়া, প্রসন্ন সলিলা গিরি-নির্ঝরিণী করতোয়া, তখন যেন অতি সানন্দ মনে চলাচল করিতেছিলেন। তখন নবীন বসন্তাগমের নব প্রভাত! নবীন-কিরণ-তপনে নূতন সংসার! প্রভাতের নয়টা বাজিতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল।

তখন সাড়ে আটটা ঠিক কাঁটায় কাঁটায়। গঙ্গাতীরবর্ত্তী একখানি দ্বিতল অট্টালিকায়, দুইটী ভীম-বলিষ্ঠকায় মধ্য বয়সী যুবক, তখন কর্ম্মবিষয়ক নানা কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। সে উভয় যুবকই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। একজন ধনপতি প্রেমজী পেশোয়া, আর অপর ব্যক্তি সে বড়ই দুর্ভাগ্য! সে আমাদের দীনহীন কালাচাঁদ।

পাঠক! প্রেমজীর ন্যায় পিশাচের আশ্রমে, সহসা কালাচাঁদকে উপস্থিত দেখিয়া, আপনি বোধ হয় সবিশেষ বিস্মিত হইবেন; কিন্তু অভ্যন্তর-রহস্য ভেদ হইলে, সেটুকু আর চিন্তা করিতে হইবে না। বুঝিবেন, এমনটা প্রায়ই নর-ভাগ্যে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে।

ইতঃপূর্ব্বে গঙ্গাবক্ষে যে সঙ্গীত শুনিয়া, সঙ্গীতমুগ্ধ কালাচাঁদ সে তাহার অমূল্য জীবনকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল। যে পান্সীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, যে রমণীর উদ্দেশে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিল, সে রমণী আর কেহই নহে; সে আমাদের সেই পূর্ব্বকথিত দুনিয়া।

দুনিয়া পান্সী হইতে অবতরণ করিয়া, মরাল-গামিনীবস্থায়, যখন সে পল্লীপথ অতিক্রম করিতে লাগিল, কালাচাঁদ তখন অদূরে

একটী অশ্বত্থবৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া, তাহাকে সে বারম্বার দেখিতেছিল। কতবার দেখিল! দেখিতে দেখিতে কতবার দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িল। সুন্দর রূপালোকে নয়ন মন ঝল্‌সিয়া গেল; কিন্তু দেখিবার সাধ তাহার তবুও মিটিল না। দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া, দৃষ্টিতারা অন্ধকারে বিলীন হইল; কিন্তু কালাচাঁদের তবুও চৈতন্যোদয় হইল না। পূর্ব্বে সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াছিল, এইবার সে দুনিয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

এই দিবস হইতে সে সমস্ত ভুলিল। তাহার গলায় এক ছড়া যে সোণার হার ছিল, সেই হার ছড়া বিক্রয় করিয়া, দৈনিক আহার খরচ চালাইতে লাগিল। আর দুনিয়াকে দেখিবার নিমিত্ত, সেই পথে, সেই গাছতলায়, তখন হইতে বোধ হয়, সে চিরদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপ ভাবে কয়েক দিবস অতীত হইলে, একদিন প্রাতঃকালে সে দেখিল, যে—যে বাড়ীতে দুনিয়া বাস করিত, সে বাড়ী সহসা চাবিরুদ্ধ হইয়াছে। দুনিয়া নাই! রাতারাতির মধ্যে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া, তখন তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুনিয়ার অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়া, তখন হইতে সে চিরজীবন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিবার বাসনা করিল।

পাঠক! দুনিয়া যে এখন প্রেমজীর আশ্রয়ে, সেটা বোধ হয়, আপনাকে আর না জানাইলেও চলে। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে যামিনী নাথের দ্বারায় সে যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিল, সেই পত্রের মতানুযায়ী প্রেমজী সম্মত হইয়াছেন বলিয়া, তাই সে এখন স্বেচ্ছায় তাঁহার আশ্রিত ও বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

আজ পনর দিবসের পর কালাচাঁদ তাহার প্রকৃত সন্ধান পাইয়াছে। সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া, ভাগীরথীর পরপারে আসিয়া,

তাই সে আজ প্রেমজীর পাপপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চাকুরী স্বীকার তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; ও একটী উপলক্ষ মাত্র।

কালাচাঁদ চাকুরী প্রার্থনা করিল। প্রেমজী তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, সহাস্যমুখে কহিলেন,—"চাকুরীর অভাব কি? ইচ্ছা ক'র্‌লেই ক'র্‌তে পার।"

কালাচাঁদ্‌ কহিল,—"অবস্থাপন্ন সংসারে অভাব ত' কোন দিনই থাকে না। তবে সে এখন আপনার অনুগ্রহ।"

প্রেমজী। না—না, সে বিষয় তোমায় আর ভেঙ্গে ব'ল্‌তে হবে না। দরিদ্রের দুঃখটা আমি খুব ভাল রকমই বুঝি।

প্রেমজীর হৃদয় অতি পাষাণ হইলেও, তিনি যে আজ এতখানি দয়ার্দ্র হৃদয়, এ কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তিনি একটী নূতন দস্যুর আড্ডা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই আড্ডাটী যাহাতে সুশৃঙ্খলা-রূপে চলিতে পারে, তাহারই চেষ্টা। গোবিন্দলাল, মঙ্গলরাম ইত্যাদি করিয়া দুই চারিজন বিচক্ষণ মতিমান্‌ বর্ত্তমান থাকিলেও, আড্ডাতে এখন বিশ পঁচিশটা মাথার প্রয়োজন। অতএব এ ক্ষেত্রে তাঁহার তাবেদে যত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়, ততই মঙ্গল। পরিশেষে বাছাই করিলেই দু-দশটাকে কাজে লাগিবে। এইভাবে এই চিন্তার আন্দোলনে, তাঁহার সৌখ্যময়চিত্ত-সরোবর আন্দোলিত করিয়া, আনন্দের মধুর তরঙ্গোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির বিমল রেখা ফুটিয়া উঠিল। আর কালাচাঁদ!—এ অবস্থায় তাহারও সুখের সীমা রহিল না। এতদিনের পর সে এইবার দুনিয়ার সন্ধান পাইল। হৃদয়-প্রতিমা খানিকে নয়নসম্মুখে রাখিয়া, এইবার সে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে পারিবে।

কালাচাঁদের হৃদয় উৎফুল্লে নাচিয়া উঠিল। সে পুনরপি কহিল,—"আমায় কি ক'র্‌তে হবে?"

প্রেমজী কহিলেন,—"কিছু না—কিছু না. কেবলমাত্র দু-এক কলম লেখা। তুমি লেখা পড়া জান ত'।"

কালাচাঁদ। অল্প অল্প জানি।

প্রেমজী। তা হ'লেই হবে। যাও, তুমি এখন স্নানাহার সেরে নাও।

এই কথা শেষ করিয়া, প্রেমজী একটি ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন। ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকে বলিলেন,—"দেখ, এ লোকটী নূতন। একে নিয়ে উপস্থিত স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দাও গে। তার পর যা কিছু ক'র্‌তে হয়, আমি ক'র্‌ব।"

আদেশ মাত্র ভৃত্য হুকুম পালন করিতে অগ্রসর হইল। কালাচাঁদকে সঙ্গে লইয়া, কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, সে তখন নিম্নতলে অবতরণ করিতে লাগিল।

কালাচাঁদ চলিয়া যাইবার পর, প্রেমজী ভাবিলেন,—"লোকটা বোধ হয় কাজের হবে। দু-দিন পরে বশে এলে, ওর দ্বারা তখন বড় বড় কাজ হাসিল হ'তে পারে। এখন আমি ছোট খাট কাজে হাত লাগাতে চাই না। যখন দুনিয়া বিবি আমার হ'য়েছে, প্রণয়-প্রতিমা যখন হৃদয়-মন্দির অধিকার ক'রেছে, তখন বিপুল উৎসাহে বড় বড় কাজ বাগান চাই! ক্রোড়পতি আছি, এর ওপর বিশ ক্রোড় টাকার মালিক হ'তে চাই।"

প্রেমজী এইরূপ নানাবিধ সুখ-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে অন্দর মহালের ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান হইতে, ফুটন্ত যুথিকার সুমিষ্ট সৌগন্ধ ভাসিয়া আসিয়া, সুসজ্জিত ও সুরম্য হর্ম্মরাজি শোভিত বিলাস-কক্ষ, আমোদিত করিয়া তুলিল। দুনিয়ার সঙ্গীত কাকোলী, সুমন্দ সমীরে মিশিয়া, দক্ষিণের জানালা পথ দিয়া, কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সে কক্ষের সৌন্দর্য্য-কলা, তখন যেন চন্দ্রকলার ন্যায় শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সে অতি সুমধুর সঙ্গীত।

মুক্ত ছাদের উপর হইতে দুনিয়া গাহিল,—

সখা!—

অশ্রুমালায়, ভূষিব তোমায়,

কণ্ঠ-সুধায় তুষিব প্রাণ;—

এ নহে তুষার, প্রেমের পাথার,

এ নহে প্রাণের প্রকৃত দান।"

সঙ্গীত সমাপ্তে প্রেমজী আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। দুনিয়ার নাম স্মরণ করিয়া, দুনিয়ার উদ্দেশে তিনি তন্মুহূর্ত্তে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নীলকুঠীর হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া গিয়াছে। উক্ত ঘটনার পর মুহূর্ত্তেই, আহত কনেষ্টবলের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পর গরিজানের ইচ্ছামতে, ঘোর বিপজ্জনক কুঠীর চতুস্পার্শ্বে, অসংখ্য পুলিশ পাহারাও নিযুক্ত হইয়াছে। গরিজান তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিবার নিমিত্ত, দৌরাত্মকারী দস্যু দমনার্থে, নানা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আর এই অবসরে, একদিন সন্ধ্যার অনতি-পূর্ব্বে, নীলকুঠীর কুড়ি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, একখানি নির্জ্জন অট্টালিকায়, দুইজন বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি, চিন্তা বিমর্ষভাবে নীরবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অট্টালিকাখানি অতি নির্জ্জনস্থানে সংরক্ষিত। ইহার চতুস্পার্শ্বে বৃহৎ উলুবন। সম্মুখে প্রকাণ্ড জঙ্গল। এ স্থানে মানুষের সচরাচর যাতায়াত সম্পূর্ণ নিবদ্ধ। বাড়ীখানি প'ড় বাড়ী।

ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি মুসলমান। তিনি নীল-

কুঠীর পূর্ব্বপরিচিত, আমাদের সেই বিখ্যাত কেসিয়ার, বাবু মৌলবী জান। অপর ব্যক্তি যুবক। সে মৌলবীজানের সহচর বা পূর্ব্বানুচর। তাহার নাম যামিনীনাথ সরকার।

পাঠক! বেকার সাহেবের সমূহ সর্ব্বনাশ, যে এই মৌলবীজানের দ্বারাই সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তহবিল তছরূপের প্রথম দিবসে, কুঠী-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, যামিনীনাথের হস্তে যিনি বিশ হাজার টাকার নোট দিয়াছিলেন, তিনি এই মৌলবীজান ব্যতীত আর কেহই নহেন। ইহার পর যে পুলিশ হত্যা ও পুনরায় চুরি হইল, সেটুকুর মধ্যেও ইনিই সর্ব্বপ্রধান। ইনিই দস্যুদলের সর্দ্দার বা অনুচর। ইঁহার অপর নাম সৈয়দ আবদুল্লা সাহেব।

নরপিশাচ হইলেও আবদুল্লা সাহেব শিক্ষিত ব্যক্তি। বিদ্যায় ইনি যথেষ্ট পারদর্শীলাভ করিয়াছেন। আজীবন স্বাধীন দস্যু-বৃত্তি পালন করিয়া, আজ যে তিনি পরাধীনতা স্বীকার করিয়া, নীলকুঠিতে কেসিয়ার হইয়াছিলেন, সে কেবল এই সর্ব্বনাশটুকু সংসাধন করিবার নিমিত্তই। বেকার সাহেবের কোমল বক্ষস্থলে, এই কঠিন কুঠারাঘাত করিবার জন্যই।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল পূর্ণ হইয়া গেল। যামিনীনাথ একটি দীর্ঘ মর্ম্মশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"ওস্তাদ! তুমি এখন কি ক'র্‌তে চাও?"

মৌলবীজান ওরফে আবদুল্লা সাহেব কহিলেন,—"তুমি যা বল তাই। তোমার কথায় আমি যথেষ্ট প্রত্যয় মানি।"

যামিনী। তা আমিও জানি। তবে এ যা ব'ল্‌ছি, সে কেবল তোমার মতামত জান্‌বার জন্য।"

আবদুল্লা। আমার মত তোমার মতের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌বে না। তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি তাতেই সম্মত আছি।

যামিনীনাথ দৃঢ়ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"তবে শোন! আমার মতে এ বড় নিরাপদ স্থান নহে। কেন না, মহম্মদ পরিজান একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা। তার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই।"

যামিনীনাথের সতর্ক-বাক্যে আবদুল্লা সাহেবের প্রাণ সত্য সত্যই কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি শশব্যস্তভাবে কহিলেন,—"এখন কোথায় যেতে চাও?"

যামিনী। আমাদের নূতন আড্ডায়। মাটির পঞ্চাশ হাত নীচে থাকলে, ভয়ের কোনই কারণ থাকবে না। চেষ্টা ক'র্‌লে হয় ত' পরিজানকে আমরাই হত্যা ক'র্‌তে পার্‌ব।

আবদুল্লা। তা বেশ, এতে আমি এখনি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তবুও যেন সুস্থির হ'তে পাচ্ছি না। পুলিশকে হত্যা করা ন্যায্য কাজ হয়নি। কেশটা বড় ভারি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

যামিনীনাথ বাধা দিয়া কহিলেন,—"তা হ'ক্। মধ্যে মধ্যে ও রকম দু একটা মরাই মঙ্গল। দুদিন পরে দুনিয়া বিবির দ্বারায়ও একটা হত্যাকাণ্ড হবে। সে যে আজ প্রেমজীর অধীনা হ'য়েছে, সে কেবল তাহাকে হত্যা করবার মতলবে। বেঁচে থাক্‌লে সে আমাদের কাছ থেকে বিস্তর টাকা আদায় ক'র্‌বে। আমরা তার কাছে প্রায় লাখ টাকার ঋণী।"

আবদুল্লা কহিলেন,—"দুনিয়া এতে সম্মত হ'য়েছে ত'? বিশ্বাস সে আমাদের খুবই শরণাগত।

যামিনী। নিশ্চয়ই। তা না হ'লে তাকে পাঠাব কেন?

উভয়ে কিছুক্ষণের নিমিত্ত এইরূপ নানা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় অট্টালিকার বহির্ভাগে কিসের একটা শব্দ হইল। শব্দটা প্রকৃত মনুষ্য পদ-শব্দ কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু পাপীর মন বলিয়া, তাঁহাদের উভয়েরই প্রাণ তখন অত্যন্তই বিচলিত

হইয়া পড়িল। আবদুল্লা সাহেব শশব্যস্তে কহিলেন,—"কিসের শব্দ হ'ল বল দেখি?"

যামিনীনাথ প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া, নির্ভয়ে কহিলেন,—"ও কিছু না। চল, যাওয়া যাক্।"

আবদুল্লা সাহেব অতি চিন্তিত মনে কহিলেন,—"কোথায় যাবে?"

যামিনী। আমাদের নব-নির্ম্মিত পাতাল-পুরীতে।

আবদুল্লা। আজই?

যামিনী। হাঁ। চল, আর কাল বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই। অপরাপর অনুচর বর্গ উপস্থিত সেই স্থানেই র'য়েছে।

কথা-প্রসঙ্গে যামিনীনাথ দুই এক পদ অগ্রসর হইতেও ছাড়িলেন না। কক্ষের বহির্দ্বারে আসিয়া, তিনি পুনরায় কহিলেন,—"আবদুল্লা সাহেব! এ কুটীরের মমতা পরিত্যাগ কর। ক্ষুদ্র কুটীর তোমার হৃদয়কে রক্ষা ক'র্‌তে পারবে না।"

আবদুল্লা সাহেব অন্য উপায়ন্তর না দেখিয়া, অগত্যা তিনি কুটীর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। পরক্ষণে সদর দ্বার অতিক্রম করিয়া, উভয়ে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হইয়া চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আজ বড়ই সুখের যামিনী। সুনীলিম গগনতলে চন্দ্র বিরাজিত। সুনীল স্বচ্ছ-সরোবরে, চন্দ্র-সুধা-পরিপ্লুত। তদুপরি পুষ্প-সৌগন্ধ-সিক্ত পল্লী-ভূমি আন্দোলিত করিয়া, সুশীতল বসন্ত বায়ু তখন দিগ্‌দিগন্ত বিস্তার করিতেছিল। তখন রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়াছে।

সুনির্ম্মিত অট্টালিকার সুবৃহৎ কক্ষে দীপাবলী সজ্জিত রহিয়াছে। কক্ষের বিচিত্র দেওয়াল-গাত্রে, নানা বর্ণের নানারূপ চিত্র সুশোভিত রহিয়াছে। এমন সময় সেই কক্ষতলের সুকোমল গালিচায়, একটি রূপবান যুবক ও রূপময়ী যুবতী, পরস্পর সুরাপানে নিযুক্ত ছিল। যুবক অকপট চিত্তে মুহুর্মুহু সুরাপান করিতেছেন, আর যুবতী পাঁচবার ভাঁড়াভাঁড়ির পর, এক একবার উপরোধ রক্ষার নিমিত্ত, অতি অল্প মাত্রায় সেবন করিতেছে। যুবক তাঁহার আরক্ত বর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, যুবতীর কোমলসদৃশ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণে, অন্তরে অনন্ত সুখানুভব করিতেছেন, আর যুবতী তাঁহার সে কটাক্ষবাণে, বাণ-বিদ্ধ হরিণীর ন্যায়, কঠোর মৃত্যুজ্বালা অনুভব করিতেছে। সে উত্তপ্ত দৃষ্টিপথে পড়িয়া, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়-ভূমি যেন শ্মশান-চুল্লির ন্যায় বিদগ্ধ হই-তেছে। যুবক নেশাচ্ছন্ন মনে ভাবিতেছেন,—"তুচ্ছ স্বর্গ! স্বর্গ আর কোথায়, এই ত' স্বর্গ! আর যুবতী মনের জ্বালায় ভাবিতেছে,—"উঃ! এ নরক জ্বালা আর কতদিন সহ্য ক'র্‌ব? মর্‌তে হয় ম'র্‌ব, কিন্তু আজ তার প্রতিবিধান ক'র্‌তে ছাড়ব না।"

যুবতী মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে যুবক মনোল্লাসে বিভোর হইয়া, সহাস্যে কহিলেন,—দুনিয়া! "আমায় ক্ষমা কর। তেমন কাজ এ জীবনে আর কখন ক'র্‌ব না। তোমার স্বামীকে যে হত্যা ক'রেছি, সে কেবল তোমারই জন্য। তা না হ'লে সে আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, বিনা দোষে তাকে আমি কিছুতেই হত্যা ক'র্‌তুম না।"

পাঠক! যুবককে চিনিলেন কি? ইনি আমাদের সেই ধনপতি প্রেমজী পেশোয়া।

প্রেমজী মনের আগ্রহে যে কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে দুনিয়ার হৃদয়ে, ভীষণ প্রতিহিংসা-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া

উঠিল। দৃঢ় উত্তেজিত স্বরে সে কহিল,—"প্রেমজী! আজ আমাদের উভয়ের এ শুভ-সম্মিলন কেন জান?"

প্রেমজী কহিলেন,—"না তোমার কথা সে তুমিই ব্যক্ত ক'র্‌তে পার। আমি তার কি বুঝব'!

ডুনিয়া। বেশ; তবে প্রস্তুত হও! এই দেখ, শাণিত অস্ত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে র'য়েছে।

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, ডুনিয়া তাহার ফিরোজা বর্ণের পেশোয়াজের ভিতর হইতে, একখানি বৃহৎ ছুরি বাহির করিয়া ফেলিল। উজ্জ্বল দীপালোকে ছুরিখানি তখন মণি-খণ্ডের ন্যায় ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রেমজী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়-ভূমি টলমল করিতে লাগিল। অতি ক্ষীপ্র-গতিতে ডুনিয়ার সম্মুখীন হইয়া তিনি কহিলেন,—"একি ডুনিয়া! কোমল হস্তে এ কঠিন অস্ত্র কিসের জন্য?"

ডুনিয়া পশ্চাৎ হটিয়া কহিল,—"তোমাকে হত্যা ক'র্‌ব তাই।"

প্রেমজীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। একে মদের নেশা, ইহার উপর মনের বিকার যেন সম্পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। প্রাণের ভয়ে আপাদ-মস্তক তাঁহার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি কহিলেন,—"ডুনিয়া! আমায় মার্জ্জনা কর! ভালবাসি ব'লে প্রাণে হত্যা ক'র না। আমি তোমার দাসানুদাস!—তোমার প্রেমের ভিখারী।"

ডুনিয়া সগর্ব্বভরে মস্তকোত্তলন করিয়া কহিল,—"না না, তুমি আমার শত্রু! তুমি আমার স্বামীকে হত্যা ক'রেছ। এইবার আমার পালা। এইবার আমি তোমায় হত্যা ক'র্‌ব। তোমায় হত্যা ক'র্‌লে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তোমায় হত্যা ক'র্‌লে, আবদুল্লা সাহেবের লাখ টাকা বেঁচে যাবে।"

প্রেমজী ভয়বিহ্বল প্রাণে ও অত্যধিক উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"দুনিয়া!—আমি তোমায় দুই লক্ষ টাকা দিচ্ছি। তুমি আমায় প্রাণে মেরো না। উঃ!—ছুরির জ্বালা বড় জ্বালা!—ছুরির জ্বালা বড় জ্বালা!"

প্রেমজী একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দুনিয়া তাহাতে বাধা দিয়া কহিল,—"সাবধান! বেশী চেঁচিয়ো না।"

প্রেমজী করুণা প্রার্থনা পূর্ব্বক কহিলেন,—"দুনিয়া! আমায় রক্ষা কর! আমায় হত্যা ক'র্‌লে তুমি কখন সুখী হ'তে পারবে না।"

"তবে তাই হক্!" এই কথা বলিয়া, অতি দ্রুতবেগে দুনিয়া তখন প্রেমজীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় প্রেমজী অন্য উপায় না দেখিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তিনি কক্ষের বাহির হইয়া পড়িলেন।"

"সয়তান!—সয়তান!" ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে, প্রেমজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুনিয়াও অগ্রসর হইল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে, তাহার দক্ষিণ বাহুখানি কে যেন সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"সাবধান রমণী! ধর্ম্মপথ অতিক্রম ক'রে, অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'র না। নরহত্যা মহাপাপ।"

দুনিয়া তাহার চিত্তবেগ সম্বরণ করিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, যে একজন গৌরকান্তি বলিষ্ঠকায় যুবক, তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, তখনও তাহার বাহুখানি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিয়াছে। লজ্জায়, শঙ্কায়, উত্তেজনায় ও অধীরতায়, দুনিয়ার অন্তঃকরণ তখন যেন আকুলে কাঁদিয়া উঠিল। সে কহিল, "কে তুমি?"

যুবক কহিল,—"প্রেমজী পেশোয়ার একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী।"

দুনিয়া। তোমায় কি আমি চিনি না?

যুবক। না। তা যদি চিন্‌তে, তা হ'লে আজ আমার এ দুরাবস্থা হ'ত না। আমার নাম কালাচাঁদ সর্দ্দার।

কালাচাঁদ অন্তর জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া, দুনিয়াকে একবার দেখিবার জন্য কাছারি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি এই স্থানে আসিয়াছিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণে যাহা ঘটিল, তাহা পাঠক-গণের অবিদিত নহে। সে কথার দ্বিতীয় উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

কথান্তরে কালাচাঁদ পুনরপি কহিলেন,—"সুন্দরী! অস্ত্র পরি-ত্যাগ কর।"

কালাচাঁদের কথানুসারে দুনিয়া তাহার হস্তস্থিত ছুরিখানি ভূমি-তলে নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"যুবক! তবে তোমারই মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক্। এত চেষ্টাতেও যখন শত্রু-বিনাশ ক'র্‌তে পাল্লুম না, তখন আর পরকে মারবার চেষ্টা ক'র্‌ব না। এইবার নিজেই ম'র্‌ব।"

কালাচাঁদ দুনিয়ার সুকোমল বাহুখানি পরিত্যাগ করিয়া কহি-লেন,—"কেন রমণী! এ অনুতাপ তোমার কিসের জন্য ?"

দুনিয়া। তুমি তা শুন্‌বে কি ?

কালাচাঁদ। হাঁ অবশ্যই শুন্‌ব'।

দুনিয়া। তবে চল, ছাদের উপর চল।

কালাচাঁদ। চল।

তখন রজনীর দ্বিতীয় প্রহর। নিথর নিশীথ সময়ে, নির্জ্জন ছাদের উপর উপস্থিত হইয়া, তাহারা দেখিল যে, প্রকৃতির বিচিত্র বক্ষে, অপূর্ব্ব নৈশঃ-সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে, পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তখন পূর্ণ-যৌবনা। মধুর চন্দ্রোচ্ছ্বাসিত ক্ষুদ্র তরঙ্গ-বিক্ষেপে, পবিত্র ও স্বচ্ছ-সলিল তখন কাণায় কাণায় পূর্ণ করিতেছিল। আজ যেন ভরা গাঙ্গে চাঁদের আলো!

সুন্দর জ্যোৎস্নালোকে কালাচাঁদ দেখিল, যে গঙ্গার শ্বেতবারি-বক্ষে, স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, স্বর্ণময়ী দুনিয়া তখন নীরবে দণ্ডায়-মান। তাঁহার হাস্যকরোজ্জ্বল ফুল্লানত মুখখানি, তখন স্বপ্নমাখা রূপ-প্রহেলিকার ন্যায়, নানাবর্ণে রঞ্জিত হইতেছিল। সে রূপ অতি চমৎকার!

সে অপূর্ব্ব মাধুরী চাতুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, কালাচাঁদ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। স্নেহ ভরে ডাকিল,—"রূপসী!"

স্নেহ স্বর দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিল। অদূরস্থ নিকুঞ্জভূমি মুখরিত করিয়া, মধুর সুরে মধুর কোয়েলা-সুতান ভাসিয়া গেল। কালাচাঁদ পুনরায় ডাকিল,—"রূপসী!"

রূপসী!—সৌন্দর্য্য-গরিয়সী!—সোণার দুনিয়া!—তখন সোণা-মুখে কহিল,—"কি ব'ল্‌ছ যুবক?"

কালাচাঁদ। তুমি কি চাও?

দুনিয়া। যুবক!—জীবনের সমস্ত প্রার্থনা শেষে হ'য়ে গেছে। এখন আমি মৃত্যু চাই।

কালাচাঁদ। আর যে কি ব'ল্‌তে চেয়ে ছিলে?

দুনিয়া। হাঁ! সে আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা। তুমি যে প্রেমজীর আশ্রয়ে আশ্রিত, এমন একটা দিন চ'লে গেছে যে, এই প্রেমজীর আশ্রয়ে থেকে, আমার ইষ্টদেবতারও একদিন জীবন-লীলা সাঙ্গ হ'য়েছে। আমার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, নির্দ্দয় প্রেমজী তাঁকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে। তিনি আমার স্বামী! আমার স্ফুপটনোন্মুখ যৌবন কালে, তিনি আমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন, চেষ্টা ক'র্‌লে আমি তখনই আত্মহত্যা ক'র্‌তে পারতুম্, কিন্তু অত্যাচারীর মুণ্ডচ্ছেদ করবার জন্যে, তা পারলুম না। মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিলুম, সোণার সতীত্ব-রত্ন স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিলুম, কত কু-কর্ম্ম সাধন

ক'র্লুম, কিন্তু ম'র্তে পারলুম না। মনে ভেবেছিলুম মেরে ম'র্ব! তা আর হ'ল না।

তুনিয়ার খেদপূর্ণ ভাগ্য-কাহিনী শুনিয়া, কালাচাঁদ অত্যধিক উত্তেজিত স্বরে কহিল,—"রূপসী! তবে তুমি তাই কর। যার জন্য এত গুলি অমূল্য রত্ন-রাজি বিসর্জ্জন দিয়েছ, সেই কর্ম্ম তুমি অনায়াসে সংসাধন কর। আমি তোমার সহায়তা ক'র্তে প্রস্তুত আছি।"

তুনিয়া কহিল,—"না—না, আর তা হবে না; আমার দিন ঘুনিয়ে এসেছে। এই দেখ যুবক! এইবার আমি নিজে ম'র্ত্তে চল্লুম।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে, সুউচ্চ ছাদের কার্ণিশ হইতে, পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী-জলে ডুবিবার জন্য, তুনিয়া ঝম্পপ্রদান করিল। আর সে মৃত্যুর মহাকবল হইতে, সে সুবর্ণ প্রতিমাখানিকে উদ্ধার করিবার জন্য, নিঃস্বার্থ প্রাণে কালাচাঁদও তথন সেই পথ অনুসরণ করিল। গঙ্গার ফেনিল জলরাশির গর্ভ হইতে, একটা মহানন্দের সঙ্গীত ঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়া, বিশ্ব-বীণায় তথন যেন প্রেমের সুতান জাগাইয়া তুলিল। জয়—প্রেমের জয়! জয় প্রেমের জয়!!"

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।